সতু সেন ঃ

আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সম্পাদনা অমিতাভ দাশগুপ্ত



আশা প্রকাশনী
:৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

Satu Sen : Atmasmriti o Annanay Prasanga
Edited by Amitabha Dasgupta

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
মাঝি প্রেস
প্রশান্ত রায়
২৮বি, সিমলা ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

তরুণ নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীদের হাতে

দু'চার কথা

বিগত যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের মহান প্রয়োগাচার্য এবং আধুনিক নাট্যভাবনার এক প্রধান পুরুষ সতু সেনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ। অপরিমেয় স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছে। শেষের দিকে, যখন তিনি শরীরের দিক থেকে অনেকখানি অপটু হয়ে পড়েছেন, তখনও আমার কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। সত্যিকারের আধুনিক মানুষ ছিলেন তিনি। থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন আন্দোলনে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। নাট্যজগতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে, যেমন, নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল-বিরোধী আন্দোলনে আমরা সব সময় তাঁর উপদেশ ও সহ-যোগিতা লাভ করেছি।

সতু সেন শুধু প্রথমই নন, একমাত্র ভারতীয়, যিনি দীর্ঘ-কাল পাশ্চাত্যে হাতে-কলমে আন্তর্জাতিক নাট্যরীতি শিক্ষা করেছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালকদের মহড়াকক্ষ থেকে পাঠ নিয়েছেন। আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশে বিশ শতকের প্রথম পর্বে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে

যে নতুন জোয়ার এসেছিল, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের দুর্লভতম সুযোগ তাঁর হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিনিই একমাত্র ভারতীয়, যিনি একান্ত তরুণ বয়সে নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত নাট্যমঞ্চে পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। উডস্টকে (Woodstock Play-house) একটি নতুন থিয়েটার প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতীয় নাট্যকলার প্রতিভূ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর নাট্য সংস্থাকে পাশ্চাত্যের নাট্যামোদীদের কাছে পরিচিত করার জন্য তাঁর একক ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সতু সেন মঞ্চে নাটকের উপস্থাপনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। নাটককে তিন ঘণ্টার সময় সীমার মধ্যে বেঁধে দেয়া, মনস্তত্ব-সম্মত আলোক-সম্পাত, বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিস্থিতির মঞ্চ রূপদান, ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, শোভন শিল্পরুচির সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার মিশ্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলির উদ্ভাবনা এদেশে তিনিই প্রথম করে-ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ঝড়ের রাতে', 'মহানিশা', 'চরিত্রহীন', 'দুই পুরুষ', 'কামাল আতাতুর্ক' ইত্যাদি প্রযোজনার নাম বিশেষ-ভাবে করা যায়। সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের একজন পরিচালক হিসাবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর শিল্পী জীবনের ইতিহাস স্বার্থহীন, কঠোর সংগ্রামের ও অধ্য-বসায়ের ইতিহাস। মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার দরুণ আমার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অনু-ধাবন করা সম্ভব হয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে তাঁর অবদানগুলি কতখানি ধনী করেছে।

তিনি যে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মঞ্চ স্থাপত্যের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে যুক্ত থাকার সময় আমি একটি কক্ষে কালের ধুলোয় জীর্ণ

নানা ধরণের যন্ত্রপাতি দেখতে পাই। আমার ঔৎসুক্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিণত হয় যখন জানতে পারি সে সব কিছুই সতু সেন আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে প্রকাশ করার জন্য নিজের পরিকল্পনা-অনুযায়ী নির্মাণ করেছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় এদেশে আজ পর্যন্ত নাট্য-সংক্রান্ত কোনো মিউজিয়ম গড়ে ওঠেনি, যেখানে বিগত যুগের শিল্পীদের কাজকর্মের নিদর্শন-গুলিকে রক্ষা করা, সেগুলির মডেল বা আলোকচিত্র একালের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সতু সেন ছাড়াও সেকালের পটলবাবু, পানুবাবু প্রভৃতি প্রয়োগবিদরা কি অবদান রেখে গেছেন, তা সাধারণের পক্ষে জানার উপায় নেই। সেকালের কথা তো বাদই দিলাম, এই সেদিনের বা অনতি-অতীতের অঙ্গার, কল্লোল, রক্তকরবী ইত্যাদি মঞ্চসফল নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের চরিত্র কি ছিল, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নাট্যানুরাগীরা তা উপলব্ধি করারও কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না বা পাবেন না। এ সব কিছুর মূলেই আছে আমাদের ইতিহাস-চেতনা, শিল্প-রীতির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। একথা তাই অনেকেরই জানা নেই যে, মঞ্চ, নাটক ও থিয়েটার সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সতু সেন কেবল আত্মস্থ করেন নি, অসংখ্য নাট্যকর্মী ও নাটক-বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রী তাঁর পদতলে বসে আলোকসম্পাত, মঞ্চকারু এবং অভিনয়-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়েছেন।

সুখের বিষয় তাঁর জামাতা ও একালের একজন প্রখ্যাত কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর কিছু কিছু রচনা, স্মৃতিকথা এবং তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন অনালোচিত তথ্য নিয়ে, এই মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি ও দেশের সমস্ত নাট্যকর্মী এই কাজের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

আমি আন্তরিকভাবেই মনে করি, এই সঙ্কলনটি প্রতিটি নাট্যকর্মী, নাট্যামোদী এবং বিশেষভাবে নাটক-বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য করা উচিত। যে সব জায়গায় নাটকের পঠন-পাঠন চালু আছে, সে সব ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ব'লে আমার বিশ্বাস।

পরম শ্রদ্ধেয় এক মহান নাট্য-প্রয়োগাচার্যের নামাঙ্কিত গ্রন্থের সঙ্গে সামান্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

তাপস সেন

আত্মস্মৃতি

আমার জন্ম বরিশাল। বাবা উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন দারোগা। শৈশবের বা কৈশোরের স্মৃতিচারণ ক'রে লাভ নেই, এখানে আমার কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলাই শ্রেয় মনে করি। তবে কাজ তো শুধু একটা একরোখা নদী নয়, তার সঙ্গে অনেক মানুষ, অনেক স্মৃতি ভেসে-আসা ফুলবেলপাতার মতো জড়িয়ে থাকে। জন্মেছিলাম ১৯০২ সালের চৌঠা জুন, বয়স এখন সত্তর ছুঁয়েছে, তাই বর্তমানের অবসরপ্রাপ্ত জীবনে ভিড় ক'রে আসে অনেক মুখ, অনেক টানা-পোড়েনের কাহিনী। এ সবকিছুরই অল্পবিস্তর ছায়াপাত এখানে ঘটতে পারে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটি বৃত্তি পেয়ে ১৯২৫-এর এক মেঘলা দুপুরে টমাস কুকের জাহাজে চেপে বসেছিলাম। পেছনে রেখে এসেছিলাম আমার শুভার্থী আপনজনদের, আমার কিশোরী জীবনসঙ্গিনীকে।

মতলব ছিল প্যারিসে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর আমেরিকায় যাব। এই প্যারিসেরই এক সন্ধ্যা আমার জীবন ও ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনাকে একেবারে অপ্রত্যাশিত দিকে ঠেলে দিল। আর পাঁচটা ভারতীয় যুবকের মতো বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরার বদলে এক অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার আমাকে নিয়ে গেল এক সম্পূর্ণ অজানা অস্তিত্বে। জন্ম হল মঞ্চ-প্রয়োগবিদ্ সতু সেনের।

আস্তানা থেকে বেরিয়ে এক জনবহুল এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার নামার আগে একটি রেস্তোর্ঁায় ঢুকে পড়েছিলাম। ওয়েটার এসে দাঁড়াল। ফরাসি একেবারেই জানি না, ইংরিজিতে দু-একটা খাবার হুকুম করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এক প্লেট মাংস নিয়ে ফিরে এল। বিরাট বিরাট টুকরো মাংসের—দেখে বোঝার উপায় নেই কিসের মাংস। ভীষণ রক্ষণশীল হিন্দু বাড়ির ছেলে—মনে মনে আতঙ্ক, গরুর মাংস নয় তো? হাত আর এগোতে চায় না প্লেটের দিকে। খুব একটা জবুথবু অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে এক অসম্ভব ভারি গলার আওয়াজ শুনলাম—ইণ্ডিয়ান? চকিতে ফিরে দেখি এক দশাসই চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, পোশাকে-আসাকে রীতিমতো খানদানি। আবার প্রশ্ন করলেন—ইণ্ডিয়ান? কথা আটকে গেল। শুধু বারদুয়েক ইতিবাচকভাবে ঘাড় নাড়লাম। আর একটু জোরে আবার প্রশ্ন করলেন—হিন্দু? একইভাবে উত্তর দিলাম। ভদ্রলোক বিনা দ্বিধায় আমার মুখোমুখি এসে বসলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। যখন শুনলেন আমি বাঙালি আর আমার জন্ম বরিশাল, তখন অকৃত্রিম পূর্ববঙ্গের ভাষায় আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন যে আমি হাত গুটিয়ে বসে আছি কেন। একটু উশখুস ক'রে আমার অস্বস্তির কারণ জানালাম। শুনে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন প্রৌঢ় পুরুষটি। বললেন, আমি মোছলমানের ছাওয়াল, শুয়র খাইয়্যা ফাঁক কইর‍্যা দিলাম, আর তোমার গোরু ছোয়নে ডর! তাঁর খোলাখুলি কথাবার্তায় বেশ একটু বল আসছিল মনে, বললাম—আপনার নাম?

একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে উত্তর দিলেন তিনি—হাসান শহিদ সারওয়ার্দি। অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি সেই হাসান সারওয়ার্দি, যিনি মস্কোতে বাগীশ্বরী অধ্যাপক হয়ে এসেছেন? আরও এলোমেলো এক গাদা প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল একটি ইতিবাচক শব্দ করলেন—হ। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করার পর থেকেই লক্ষ্য করলাম তাঁর ভরাট মুখে ঔৎসুক্যের অল্পবিস্তর আঁকিবুকি জেগে উঠছে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি বুঝি নাটকের ব্যাপারে

ইণ্টারেষ্টেড ? ইণ্টারেষ্টেড ! ছোটবেলা থেকে এককথায় আমি নাটক-পাগল। গাঁয়ে মাচা বেঁধে নাটক করেছি। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে আমার সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কেটেছে দানীবাবু ও তরুণ শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ছিলেন আমার দাদার বন্ধু, প্রশ্রয়ও পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। ফলে রাত জেগে নাটক দেখা, সারাদিন নাটকের কথা ভাবা, আমার এক জবরদস্ত নেশা হয়ে যায়। যখন কাশীতে পড়ি, তখন ছুটিছাটায় কলকাতায় আসার জন্য যে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকতাম, তা শুধু এই নাটক দেখার জন্য।.

সারওয়ার্দি সাহেব হচ্ছেন প্রথম ভারতীয়, যিনি নাটকের কলাকৌশল শেখার জন্য যৌবনে দেশের মায়া কাটিয়ে রাশ্যা, আমেরিকা, জার্মানি, বৃটেন ও ফ্রান্স চষে বেড়িয়েছিলেন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে তিনি কলকাতার নাট্য-আন্দোলনের বিষয়ে আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করছিলেন, সাধ্যমতো উত্তর দিচ্ছিলাম আমি। এক সময় খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি, বললেন, নাটকের ব্যাপারে তোমার যখন এত আগ্রহ, তখন এসব ইঞ্জিনিয়ারিং-টিয়ারিং পড়ার কি দরকার তোমার ? এখানে এসেছো, নাটক নিয়ে পড়াশোনা কর, হাতেকলমে কাজ শেখো, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে তোমার শিক্ষাকে কাজে লাগাও। বাঁধা পথে না হেঁটে অন্তত একটা ছেলে নতুন সড়কে হাঁটুক।

যেন একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল আমার ওপর দিয়ে। জনাব সারওয়ার্দির প্রত্যেকটি কথা আমার বর্তমান ভবিষ্যৎকে কুটোর মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়িয়ে নিচ্ছিল। সম্মোহিতের মতো বসে ছিলাম। এক নাগাড়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর মৃদুকণ্ঠে প্রায় কৈফিয়তের সুরে বললাম, এসব শেখার সুযোগ পাব কোথায়, আর কোনখান থেকেই বা আমার মতো নামহীন পরিচিতিহীন পরাধীন দেশের একটি ছেলের কাছে সে সুযোগ আসবে। সশব্দে টেবিল চাপড়ে তিনি বললেন, ঘাবড়াও মৎ। আমি তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এ চিঠি নিয়ে সোজা নিউইয়র্কে ল্যাবরেটরি থিয়েটারে চলে গিয়ে থিয়েটারের

পরিচালক রিচার্ড বলিস্লাভস্কির সঙ্গে দেখা করবে। সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি এক লহমার মধ্যে একটি প্রমাণ সাইজের চিঠি লিখে ফেললেন ও তাঁর ঠিকানা দিয়ে প্রায় নাটকীয়-ভাবে আমাকে বললেন, আমেরিকা থেকে সব জানিয়ে আমাকে চিঠি লিখবে, আমি অপেক্ষায় থাকব। আমার দেহের ওপর এক বিশাল ছায়া ফেলে তিনি মন্থরভাবে রেস্তোরাঁর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

অভিভাবকদের কাছে ছোটবেলায় বারবার সেই অমোঘ ঋষিবাক্য শুনেছি—ধ্রুব-কে ছেড়ে যে অধ্রুব-র পেছনে ছোটে, তার ধ্রুব অধ্রুব দুই-ই যায়। সেই অমোঘ বচনকে ছাপিয়ে আমার বেহিসাবি, আবেগতপ্ত মনে বারবার হাসান সারওয়ার্দির কণ্ঠস্বর বেজে উঠছিল, কোটের পকেটে তাঁর চিঠিটি খচ্ খচ্ ক'রে জানান দিচ্ছিল।

সেপ্টেম্বরের এক রোদ-ঝলমল সকালে আমাদের জাহাজ এসে নিউইয়র্কে ভিড়ল। একে বিদেশি, তায় থার্ড ক্লাসের যাত্রী, জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাকে বন্দরে নামতে দিলেন না। আমার মতো আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটি ফেরি-বোট রওনা হল এলিস আইল্যাণ্ডের দিকে। সারারাত উন্মুক্ত ডেকে ছিলাম, বুকে ঠাণ্ডা বসে গিয়েছিল। আমার কাশির ঘন ঘন দমক শুনে আমাকে আইল্যাণ্ডের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সে এক অত্যন্ত নোংরা হাসপাতাল—সেখানে খাবার তো দূরের কথা, জল পর্যন্ত ছুঁতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন বেশ সহৃদয় স্বভাবের একজন তরুণ। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটি সার্টিফিকেট আদায় ক'রে পরের দিন ভোরে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলাম।

মাটিতে পা দিতেই এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তি এসে আমাকে গ্রাস করল। যদিও আমি ফরাসি জানতাম না, তবু প্যারিস শহরকে তার বিস্ট্রো আর পথের পাশের কাফেগুলো-সমেত সব সময়ই বেশ ঘনিষ্ঠ বলে মনে হতো। নিউ-ইয়র্ক সাধারণ মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপবিহীন এক ময়দানবপুরী, দুনিয়ার

ডাকসাইটে বড়লোকদের লীলা-নিকেতন। বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়িগ্নলো নিষ্ঠুর স্পর্দ্ধায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দর্শনেই একান্ত বিহ্বল ও ভীত হয়ে পড়লাম। সেল্নন-বারগ্নলিতে পর্যন্ত বসার বন্দোবস্ত নেই। সরাইখানাগ্নলোর চেহারা ঠাণ্ডা ও অভ্যর্থনাহীন। এক কথায়, পূর্ববাংলার এক গাঁয়ের ছেলেকে নিউইয়র্ক একেবারে মৃত্যুভয় এনে দিল।

সেদিন বিকেলেই আমি ট্রেনে চেপে পিট্সবার্গের দিকে রওনা হলাম। পিট্সবার্গে আমার স্ত্রীর এক মাতুল থাকতেন, টাটা কোম্পানির লোক। সোজা গিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠলাম।

দ্ন-তিনদিন বিশ্রাম করার পর সেখানকার কার্নেগি ইন্ষ্টিট্যুট অব টেকনোলজিতে গেলাম। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানেই আমার পড়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, সেখানে নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে শিক্ষাদানের একটি বিভাগও আছে। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি না হয়ে আমি ঐ বিভাগেই নাম লেখালাম।

ক্লাস হতো রাত্রে। আমি বিদ্যুৎসংক্রান্ত বিষয়ের ছাত্র, এ কথা জানতে পেরে স্কুলের অধ্যক্ষ আমাকে কারিগরী বিভাগে ঠেলে দিলেন। মঞ্চ সম্পর্কে কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। মাস ছয়েক কেবল ছুতোরের কাজ শিখে কাটাতে হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত বিষয় গ্রহণ না করার দর্ণ আমি কোনো বৃত্তি পাচ্ছিলাম না। যদিও আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম, তব্ন নিজের হাতখরচটুকু পর্যন্ত সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দ্নষ্কর হয়ে উঠেছিল। কার্নেগি ইন্ষ্টিট্যুটের লাগোয়া ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কোম্পানিতে লোকজন নিচ্ছিল। মরিয়া হয়ে সেখানে ঢুকে পড়লাম। অ-দক্ষ মজুরের কাজ। খাটুনি ছিল প্রবল। যন্ত্রপাতি সাফ করা থেকে শুরু ক'রে ধাতু পালিশ—এককথায় যাবতীয় টুকিটাকি অথচ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হতো।

এভাবে মাস সাতেক কাটল। আমেরিকার মানুষের দ্রুত কথাবার্তা, জীবন, পরিবেশ কিছুটা ধাতস্থ হয়ে এল। অন্তত মাস দুয়েক খাওয়া-পরার মতো কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে আবার রওনা হলাম আমার নিয়তি—নিউইয়র্কের দিকে।

প্রথম ক'দিন চার্লি চ্যাপলিনের 'ট্র্যাম্প'-এর মতোই কাটল আমার। দুবার হোটেলে খাই, কখনো টিউব ট্রেনে কখনো পার্কে রাত কাটাই। পিট্ সবার্গে থাকতেই মার্কিনদের সঙ্গে মেলামেশার ভয়টা কেটে গিয়েছিল আমার। সুযোগ পেলেই রাস্তার লোকজনের সঙ্গে কথা বলি। এমনকি আমি যে খোদ ভারতীয় তা প্রমাণ করার জন্য গভীর কাপট্যের সঙ্গে তাদের হস্তরেখাও বিচার করতে বসে যেতাম মাঝে মাঝে।

সপ্তাহখানেক পর মলিন পোশাক ও দুরুদুরু বুক নিয়ে রওনা হলাম ল্যাবরেটরি থিয়েটারের পথে। জামার পকেটে সেই সযত্ন-রক্ষিত, ল্যাবরেটরি থিয়েটারের পরিচালক রিচার্ড বলিস্লাভস্কির প্রতি লিখিত হাসান সারওয়ার্দির চিঠি।

ল্যাবরেটরি থিয়েটার। ২২২ ইস্ট ৫৪ নং রাস্তা। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিল যাবতীয় নাট্যবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান, নাম, দি থিয়েটার আর্টস ইন্‌ষ্টিট্যুট। এই দুটি সংস্থার মালিক ছিলেন শ্রীমতী মিরিয়ম স্টকটন নাম্নী এক প্রভূত বিত্তশালিনী মার্কিন মহিলা। অবশ্য তাঁর চরিত্র আদৌ আমাদের দেশের পয়সাওয়ালা মালিকের মতো নয়। নাটক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল জান্তব, এ বিষয়ে পড়াশোনাও করতেন প্রচুর। নিয়মিত প্রতিষ্ঠান দুটিতে আসতেন, শিক্ষাদানের প্রণালী, নাটকের মহড়া, মঞ্চসজ্জার কাজ, অভিনয়—সবকিছুই দেখতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এক রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছিল ল্যাবরেটরি থিয়েটার। সোভিয়েতে যখন অক্টোবর মহাবিপ্লব সম্পন্ন হয়, তখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের একটি বড় দল অভিনয় করছিলেন প্রাহা-য়। এই দলে ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক স্তানিস্লাভস্কি-র সুযোগ্যতম শিষ্য রিচার্ড বলিস্লাভস্কি। স্তানিস্লাভস্কি অবসর গ্রহণ করার পর বলিস্লাভস্কিই মস্কো আর্ট থিয়েটারের হাল ধরেছিলেন। ছিলেন দুজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও অভিনয়-বিজ্ঞানের তৎকালীন অসামান্য শিক্ষিকা মাদাম মারিয়া উস্‌পেন-স্কায়া ও মাদাম মারিয়া গেরমানোভা। ছিলেন আরও অনেক মঞ্চ-স্থপতি,

রূপসজ্জাবিদ্, ব্যালে নর্তক ও নর্তকী—এককথায় পৃথিবীর এক চরম-বন্দিত অভিনয়-কেন্দ্রের চালিকাশক্তি। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন হোয়াইট রাশ্যান বা তথাকথিত অভিজাত রুশবাসী। প্রোলেতারিয় বিপ্লব তাঁদের ভীত ও সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল। দল নিয়ে বলিস্লাভস্কি আর ফিরলেন না বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়—পাড়ি জমালেন নিউইয়র্কের দিকে। নতুন নাট্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এই বিশাল সহর অধীর আগ্রহে ভ্রাম্যমাণ দলটিকে বুকে টেনে নিল। দলের পুনর্বাসন ঘটল নবনির্মিত আমেরিকান ল্যাবরেটরি থিয়েটারে।

এঁরা ইয়োরোপের নাট্য-জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন। বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে দলে দলে ছাত্রছাত্রী এসে ভিড় জমাতে লাগল থিয়েটার আর্টস ইন্‌ষ্টিট্যুটে। এঁদের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার আলোয় ম্লান হয়ে গেল আমেরিকার প্রতিটি থিয়েটার ও নাট্যশিক্ষাকেন্দ্র—এমনকি রুবেন মেমোলিয়ন ও ইভা লা গ্যালিয়নের মতো মহান পরিচালকদের অধীন থিয়েটার গিল্ড ও সিভিক রেপেটোরি থিয়েটার পর্যন্ত। মার্কিনি ছেলেমেয়েরা এমনিতেই জবর হুজুগে। তারা ল্যাবরেটরি থিয়েটারে সামান্য শিক্ষানবিশি ও থিয়েটার ইনষ্টিট্যুটে পড়াশোনা করার জন্য অধীর হয়ে উঠল।

থিয়েটারের পরিচালক বলিস্লাভস্কি তখন পরপর মঞ্চস্থ ক'রে যাচ্ছেন চেখভ, তুর্গেনেভ, তলস্তয়, শেক্‌সপিয়র, মার্লো, মলিয়ের থেকে শুরু ক'রে হাল আমলের ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, বার্নাড শ, ইউজিন ও'নিল প্রমুখের নাটক। নয়া আঙ্গিকে, নয়া বক্তব্যে, অভূতপূর্ব শিক্ষণপদ্ধতি ও মঞ্চসজ্জায় ঐ সব ক্লাসিক ও নতুন নাটকের মঞ্চ-প্রযুক্তি সমকালীন নাট্যতরঙ্গে জোয়ারের কাল ঘনিয়ে এনেছিল। শুধু নাট্য-পরিচালনাই নয়, বলিস্লাভস্কি-নির্মিত দুটি চলচ্চিত্র 'রাসপুটিন' ও থিওডোরা গোজ্ ওয়াইল্ড' হলিউডের কায়েমি দুনিয়াকে পর্যন্ত বিচলিত ক'রে তুলেছিল। এক মহান সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্য নিয়ে বলিস্লাভস্কি ও তাঁর সহযোগীরা হঠাৎ-বড়লোকের দেশ আমেরিকায় প্রবেশ করেছিলেন ও সেখানকার শিকড়বিহীন নাট্য-প্রচেষ্টাকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানে ফলবান ক'রে তুলেছিলেন। মাদাম মারিয়া

গেরমানোভা-র নাটক শিক্ষাদান সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস্-এর তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক অলিভার সেইলর-এর উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনপূর্ণ আলোচনা, আশা করি, এখানে কিছু পরিমাণে উদ্ধার ক'রে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

'With the astonishing adaptability of the Russian, she has already so thoroughly acclimated herself that at the same time she made her debut on our boards as a director of Chekov's 'Three Sisters' she made in addition her debut with us as an actress, playing the role of Masha, as well as making her debut in English, a language hitherto strange to her.

Sudden and decisive as these developments have been, I am inclined to rate more startling and significant her quick and instinctive understanding of how to get the most out of her American students. It has been no simple problem. No prior experience shed much light on it. Eager as they were to learn, those boys and girls up in East 54th Street found themselves shut off from an easy and natural acquaintance with Chekov and his characters by a host of traditions, inhibitions and psychological obstacles. It might have been possible for the director to set them patterns, examples, which they could follow painstakingly but superficially. But the heart, the soul, the true understanding, wouldn't be the result.

...It would not be fair to assert that the young Americans who have come to Mme. Germanova's hand at the Laboratory Theatre are dishonest. They are flamingly and passionately honest. But the restraint of tradition

binds the wings of their imagination and their emotions.

What then was the regisseuse to do? After several attempts she hit upon a plan. That plan might be called overt levitation. Regardless of immediate consequences, she urged these students to hoist themselves literally by their own boot-straps, from their traditional moorings. 'Be yourself by forgetting yourself', she commanded. 'If you feel like shouting, shout as you have never shouted before.' And so on with all the other emotions and human interrelations. Once far enough is the air; suspended as it were, in space above themselves, they were amenable to that shaping and patterning which would achieve the subtlest of interpretative gradations.

মাদাম মারিয়া উস্‌পেনস্কায়া-র খ্যাতি ছিল প্রধানত টাইপ-চরিত্র অভিনয়ে ও সে-সম্পর্কিত শিক্ষাদানে। 'মেরি ওয়ালেশ্‌কা' ও 'এ টেল অব টু সিটিজ্‌'এ দুটি বৃদ্ধার জটিল চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের কথা, আশা করি, একালের বহু চলচ্চিত্র-দর্শকের স্মরণে আছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে হঠকারীর অদম্য সাহসে সরাসরি বলিস্লাভস্কি-র খাসকামরায় ঢুকে পড়লাম। সুসজ্জিত ঘর। বিরাট এক ক্যাবিনেট-টেবিলের ওপাশে বসে আছেন সেই শালপ্রাংশু, প্রথিতযশা পুরুষ। সারা মুখে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দে চোখে চোখ রাখলেন সরাসরি। কোনো বাক্যব্যয় না করেই জনাব সারওয়ার্দির চিঠিটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে প্রায় যান্ত্রিকভাবে বললেন তিনি, বেশ তো, ভর্তি হয়ে যাও। আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, কিভাবে ভর্তি হব? আমার টাকা-পয়সা নেই!

—তা হলে হবে না। এ সবের আমি কি জানি? খেঁকিয়ে উঠলেন প্রৌঢ়।

আসলে থিয়েটার ইন্‌স্টিট্যুটে ভর্তি হওয়া গরীব লোকের সাধ্য নয়।

বছরে আট মাস ক্লাশ হতো। মাসিক মাইনে ছিল একশো ডলার। এত টাকা কোথায় পাব আমি? উপায়ান্তর না দেখে মরিয়া হয়ে একেবারে খাঁটি ভারতীয় প্রথায় বলিস্লাভস্কি-র পা জড়িয়ে ধরলাম ও প্রবল কান্নাকাটি শুরু করলাম। চেঁচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে থিয়েটারের কর্ত্রী মিরিয়ম স্টক্টন ছুটে এলেন। প্রবীণ পরিচালক পা ছাড়াতে চেষ্টা করছেন, এক রোগা কালোমতন ছোকরা কিছুতেই তা ছাড়তে নারাজ—এ অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখে ভদ্রমহিলা তো হতবম্ব। বললেন, ব্যাপার কি, রিচার্ড? বলিস্লাভস্কি বললেন, দিস হিন্দু ইজ মেকিং মাই লাইফ মিজারেব্‌ল। দেখুন, আপনি এর জন্য কী করতে পারেন।

অনেক বুঝিয়ে ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন। যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। তোমাকে একটা স্কলারশিপ দেবার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করব। আপাতত তুমি ভর্তি হয়ে যাও।

আমি প্রায় দিগ্বিজয়ীর মতো তাঁর ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

পিট্সবার্গের ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কোম্পানিতে মজুরি ক'রে যা সামান্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম, হিসেবমাফিক খরচ করতে না পারায় তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। আমার স্কুল বা থিয়েটার আমাকে বিনা মাইনেতে পড়াশোনা করার বা কাজ শেখার সুযোগ ক'রে দিতে পারে, কিন্তু খেতে-পরতে দিতে পারে না। সুতরাং জরুরি হয়ে উঠল নিছক প্রাণ ধারণের ও আশ্রয়ের প্রশ্ন।

সকাল আটটা থেকে থিয়েটার ইন্‌স্টিটুট্যে ক্লাস শুরু হতো। ক্লাস শেষ হওয়ার পর পরই নাটকের অভিনয় আরম্ভ হতো ল্যাবরেটরি থিয়েটারে। অর্থাৎ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাকে সেখানেই থাকতে হতো। তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বরের কামড়ে-ধরা শীতের মধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম। খাওয়ার পয়সাটুকু পর্যন্ত ফুরিয়ে গেল। অবস্থা প্রায় ভিক্ষুকের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। রাতে কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে লোকজনকে ভারতবর্ষের

নানা সত্যিমিথ্যে গল্প বলে ডিনারটুকু যোগাড় করার চেষ্টা করতাম। বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা সবসময় ফলপ্রসূ হতো না। দুপুরে প্রায়দিনই পেটে কিছু পড়ত না।

এক রাতে চূড়ান্ত ক্ষুৎকাতর অবস্থায় ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার মধ্যে একটি পার্কের বেঞ্চে বসেছিলাম। হিমে চারপাশের আলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছিল। পেটের মধ্যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা—দুই কানে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মতো শব্দ শুনছিলাম। হাতে পায়ে অসম্ভব জ্বালা—বুঝতেই পারি নি কখন ঠাণ্ডায় সারা শরীর একেবারে অসাড় হয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল, চোখের ওপর একটা গভীর কালো পর্দা নেমে আসছে। ক্রমশ জ্ঞান লুপ্ত হচ্ছিল।

তখন রাত কতো হবে খেয়াল নেই, প্রবল ধাক্কায় তাকিয়ে দেখি, সামনে একজন টহলদার পুলিশ। হয়তো সে আমাকে কোনো অসামাজিক দুর্বৃত্ত বলে ঠাউরেছিল। আমি অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ঠাণ্ডায় জিভ সম্পূর্ণ আড়ষ্ট, কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। একটা কাঠের বেঞ্চে শুয়ে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল। আমাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে কাঁধে বয়ে রাস্তা পেরিয়ে একটি পাবলিক বাথ্-এ নিয়ে এল। বাথরুমের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করল ও মাথার ওপর গরম জলের কল খুলে দিল। বহুক্ষণ স্নান করানোর পর আমার শরীর মুছে দিয়ে সে আবার ঠাণ্ডা জলে আমাকে আচ্ছা ক'রে ধুইয়ে তার ওভারকোটটি দিয়ে ঢেকে দিল। সেখান থেকে আমাকে প্রায় বহন ক'রে একটি হোটেলে নিয়ে এসে ব্র্যাণ্ডি সহযোগে বেশ কিছু খাবার খাওয়ালো।

আসলে খোলা জায়গায় অপরিমিত ঠাণ্ডায় আমার শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। পুলিশটি না এসে পড়লে সংজ্ঞা হারিয়ে সেরাত্রে মারাই যেতাম আমি।

খেতে খেতে ক্রমশ সুস্থ বোধ করছিলাম। আমার ত্রাণকর্তা আমার

মুখোমুখি বসেছিল। ধীরে ধীরে তাকে আমার পরিচয় জানালাম। খাওয়া শেষ হলে সেরাত্রের মতো লোকটি আমাকে একটি আস্তানায় নিয়ে শোবার জায়গা ক'রে দিল।

এই অত্যন্ত সাধারণ অথচ সহৃদয় মানুষটির নাম আমি ভুলে গেছি। একটি প্রবাসী, আশ্রয়হীন, অভুক্ত তরুণের প্রতি সে যে গভীর মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তা আমি জীবনে ভুলব না। সে ঐ হোটেলে আমার প্রাতরাশ ও রাত্রে আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দেয়, সংগ্রহ ক'রে দেয় ঐ হোটেলেই শেষরাত্রে থালা বাসন ধোয়ার ও একটি সেলুনে জুতো পালিশ করার কাজ। তা ছাড়া রাস্তার বরফ পরিষ্কার করেও কিছু উপায় করতাম। এভাবেই দিনে ও সন্ধ্যায় স্কুল ও থিয়েটার এবং রাত্রে হোটেল ও সেলুনে কেটে যেত।

এককথায় সবকিছুই শিখতে হতো থিয়েটার ইন্‌ষ্টিট্যুটে। পড়তে হতো ক্লাসিক ও আধুনিক নাটক, আলোর প্রয়োগ ও মঞ্চ-সম্পর্কিত যাবতীয় বই, অভিনয়শিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি। পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে কিছুদিন আগে ইন্‌ষ্টিট্যুটের পাঠ্য-তালিকাটি খুঁজে পাই। পাঠ্য-তালিকাটি ছিল বিচিত্র—ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিভিন্ন দেশের সাহিত্য—কিছুই বাদ ছিল না। এমন কি শার্লক হোম্‌স-ও পড়তে হতো। সাধারণ জ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে ছিল Italy Before the Romans, Complete French Language Course, Democracy in Islam থেকে শুরু ক'রে Savitri and Other Women নামক গ্রন্থ। সংগ্রহ করতে হতো ৩৯টি থিয়েটার-প্রোগ্রাম, ৮টি নোট বই, রং-সংক্রান্ত ৬টি নমুনা-গ্রন্থ। পড়তে হতো বিশ্বনাট্য-ইতিহাস, আধুনিক নাট্য-সাহিত্য, বর্ণালি-প্রক্ষেপণ পদ্ধতি, শেক্‌সপিরিয় আমলের মঞ্চসজ্জা, স্পেনের স্টোইক ভাস্কর্য, ফোটোগ্রাফি ও চিত্রকলা-বিষয়ক রচনা। যে সাময়িকপত্রগুলি অবশ্যপাঠ্য ছিল সেগুলির নাম : The Creative Art, The Theatre, The International Studio, The Arts, The Theatre Arts ও The Masque

প্রকরণ ও প্রয়োগ-সংক্রান্ত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল : Du Decor du Theatre, Flemish Paintings, Design in the Theatre, Modern Dancing and Dancer, Buddhistic Sculpture in Japan, Kabuki, Color in Architecture, Color and Its Application on Language of Color, Light and Shade, Light and Color Advertising, Visual Illusion, Artificial Light, Lighting Art ইত্যাদি গ্রন্থ। যেসব নাটক পাঠের মধ্যে জোর দেওয়া হতো, সেগুলির মধ্যে ছিল শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ, গিলবার্ট ক্যাননের চারটি নাটক, স্ট্রিণ্ডবার্গ, পিরানদেল্লো, মেটারলিংক, গলসওয়ার্দি এবং শেক্সপিয়রের নাট্য-সমগ্র। এ ছাড়া এমিলি ডিকিনসন ও ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা, চার্লস ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী ও এডগার এলেন পো-র রচনা অবশ্যপাঠ্য ছিল। আশা করি এই বিচিত্র চরিত্রের গ্রন্থ-তালিকা পড়তে পড়তে সুধী পাঠকবৃন্দ ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের করুণ অবস্থার কথা ভেবে সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা রাতে পড়ার সময় পেত। অথচ সে-সময়টা আমাকে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে শরীর ও মনের ওপর অবর্ণনীয় চাপ পড়ত। মাঝে মাঝে ভাবতাম সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। অথচ বাস্তবে আমি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ত নাটকের জগতের অতল নেশায় প্রতিদিন গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম।

আমার শিক্ষানবিশির মুখ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম মঞ্চসজ্জা ও আলোক-সম্পাত। আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল রবার্ট এডমণ্ড জোন্স, নর্মান বেলগেডেস ও লিভিংস্টোন প্লাট্-এর মতো অসামান্য কৃতী প্রয়োগ-বিদ্‌দের কাছে অন্তরঙ্গভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব বিভাগে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য নাট্য-আন্দোলনের স্বীকৃত দিকপাল।

মাস আষ্টেকের মধ্যে অবস্থাকে আমি কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে-ছিলাম। নিশ্চয়ই আমার অসহনীয় পরিশ্রমে কিছু ফল ফলেছিল, '২৬ সনে জুন মাস থেকে আমাকে বলিস্লাভস্কি তাঁর জুনিয়ার অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে নিযুক্ত করলেন। নর্মান বেলগেডেস-ও মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে আমাকে সহকারী

হিসেবে টেনে নিলেন। নতুন ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে কাজ শেখানোর অল্পবিস্তর দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছিল।

থিয়েটার ও ইন্‌ষ্টিট্যুট থেকেই সপ্তাহান্তে এসব কাজের মাধ্যমে আমার একার পক্ষে মোটামুটি প্রয়োজনীয় অর্থাগম হতে থাকে। এর ফল ভালোই হল। হোটেল ও সেলুনের কাজ ছেড়ে দিলাম আমি। থিয়েটারের কাছেই ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেণ্ট নিলাম। নিজেই রেঁধে খেতাম। পড়াশোনার জন্য পুরো রাতটাই নির্বিঘ্নভাবে হাতে এসে গেল আমার।

থিয়েটার ও ইন্‌ষ্টিট্যুটের স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী মিরিয়ম স্টক্‌টন আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তাঁর প্রগাঢ় ঔৎসুক্য ও নজর ছিল। হয়তো আমার কঠোর পরিশ্রম, একগুঁয়েমি ও আন্তরিকভাবে কাজ শেখার প্রয়াস তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী তখন গত। তাঁদের একটি কন্যা তখন বিবাহিতা, একমাত্র পুত্রসন্তানও জীবিকা উপলক্ষে দূরাঞ্চলবাসী। খুবই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হতো প্রৌঢ়াকে। একদিন থিয়েটারের শেষে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। ডিনারের পর দুজনে যখন কফি পান করছি, তখন তিনি প্রস্তাব করলেন, আমি শুধু শুধু পয়সা খরচ ক'রে অ্যাপার্টমেণ্টে না থেকে তাঁর বাড়িতে এসে থাকি না কেন—এতে আমারও আশ্রয় হয় এবং তাঁরও একজন সঙ্গী জোটে। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী স্টক্‌টনের এ প্রস্তাব ছিল বামনের হাতে চাঁদ পাওয়ার তুল্য। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। পরদিনই আমার পুঁথিপত্র ও বাক্স প্যাঁটরা সমেত তাঁর আশ্রয়ে এসে ঘাঁটি পাতলাম।

মায়ের মতোই আমার প্রবাস-জীবনের প্রতিকূলতাকে শ্রীমতী স্টক্‌টন তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রেখেছিলেন। তাঁকে আমি বরাবরই 'মাদার' বলে সম্বোধন করতাম। দেশে ফিরে আসার দীর্ঘকাল পরও, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমার জীবনে যা কিছু শুভ ও সাফল্য এসেছে, তা এই মাদারেরই দাক্ষিণ্যে। আমার বেপরোয়া ও বেহিসাবি স্বভাবকে তিনি যতদূর পেরেছিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। আজও এই অশক্ত প্রবীণ দেহে রোমাঞ্চের উদ্গম হয় তাঁর বাড়ির দোতলার বারান্দার

সেই প্রিয় কোণটির কথা স্মরণ হলে। ডিনারের পর ঘেরা বারান্দায় দুজনে বসতাম। কথা বলতাম ইনস্টিট্যুট নিয়ে, থিয়েটার নিয়ে। দীর্ঘ আলোচনা চলত দেশবিদেশের নাটক ও অভিনয় প্রসঙ্গে। কখনো কখনো আলোচনার বিষয় হতো একান্ত ব্যক্তিগত। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন, উত্তেজিত করতেন, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার ছক অাঁকতেন।

ভারতীয় খাবারের খুব ভক্ত ছিলেন মাদার। শনিবার থিয়েটার ও ইন্‌ষ্টিট্যুট দুই-ই বন্ধ থাকত। নানারকম রান্না করতাম নিজে, আমাকে সুখী করার জন্য মাদার যে কোনো খাবার জিভে দিয়েই এমন মুখভঙ্গি করতেন, যেন অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করছেন।

প্রায় প্রতি শনিবার তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে আসতেন এক পরম রূপবান যুবাপুরুষ। এই আগন্তুক সম্পর্কে অদ্ভুত গোপনীয়তা রক্ষা করতেন মাদার। অন্ধকারে নিঃশব্দে ভদ্রলোকের ছোট্ট সেডান গাড়িটি বাড়ির দরজায় এসে থামত। অধীর আগ্রহে তাঁর অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন মাদার। আগন্তুক এলেই তিনি তাঁর হাত ধরে একান্ত ব্যক্তিগত স্টাডিতে নিয়ে যেতেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার ছিল একান্তই তাঁদের—কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি এরকম একজন ব্যক্তি মাদারের কাছে আসেন, পরিচারকবর্গ বা আমার পক্ষেও তা বাইরে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। ডিনারও সারতেন তাঁরা ঐ স্টাডিতে বসে। দুজনেই পোলাও ও ফাউলকারি খেতে ভালোবাসতেন। আমি নিজে পরিবেশন করতাম। রাত একটু বেশি হলে নিজেই গাড়ি চালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতেন ভদ্রলোক। তাঁর উপস্থিতি ও মাদারের আচরণ আমার কাছে এক রহস্য-নাটকের মতো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল।

হঠাৎ একদিন শুনলাম লক্ষ লক্ষ যুবতীর চিত্তচঞ্চলকারী প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা রুডল্‌ফ ভ্যালেনটিনো মারা গেছেন। আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর অভিনীত কোনো চলচ্চিত্র তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমি দেখি নি। ভ্যালেনটিনোর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র মাদার শোকের পোশাক ধারণ করলেন ও আমাকে নিয়ে লোকান্তরিত অভিনেতার মরশরীর শেষবারের মতো দর্শনের জন্য

বেরিয়ে পড়লেন। হলিউডে প্যারামাউণ্ট স্টুডিও-তে অসংখ্য গুণগ্রাহীর সমাগম হয়েছিল রক্ষিত দেহটিকে ঘিরে। ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে আমরা শবাধারের কাছাকাছি এলাম। এবং মৃতের মুখের দিকে তাকিয়েই নিজের অজান্তে আমি অস্ফুটভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলাম। এ যে সেই শনিবারের রহস্যময় আগন্তুক! তাঁর জীবিত অবস্থায় কোনোদিন মাদার তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেন নি। শুধু দুঃখ নয়, মাদারের ওপর প্রচণ্ড অভিমান হল। যদি পূর্বাহ্নে জানতে পারতাম তিনি রুডল্ফ ভ্যালেন-টিনো, তা হলে কার কি ক্ষতি হতো?

পরে বুঝেছিলাম, মাদার ঠিকই ক'রেছিলেন। ভ্যালেনটিনো ছিলেন তার সময়ের নায়কদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দর্শক, বিশেষত মহিলা-দর্শকেরা তাঁকে একবার দেখার জন্য একেবারে পাগল হয়ে থাকত। আমার বয়স তখন অল্প। খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার পরিচিতি ও মাদারের কাছে তাঁর আগমন-বার্তা গোপন করতে পারতাম না বাইরের বন্ধু-বান্ধবের কাছে। ফলে, অল্পদিনের ভেতরই ব্যাপারটা পাঁচ কান হয়ে যেত এবং মাদারের কাছে আসাও ভ্যালেনটিনোকে বন্ধ করতে হতো।

থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আমার কাজকর্মের ভেতরে ক্রমোন্নতির আভাস পাচ্ছিলেন। '২৭ সনের জুন মাসে কর্তৃপক্ষ আমাকে সহকারী টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদে উন্নীত করলেন। এবং ঐ বছরেরই শেষদিক দিয়ে আমি অন্যতম সহকারী পরিচালকের পদ লাভ করলাম। নর্মান বেলগেড্ডেস সন্তানসম স্নেহ করতেন আমাকে। গভীর যত্নের সঙ্গে তিনি আমাকে শেখাতে লাগলেন আলো-প্রক্ষেপের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি, সেট-নির্মাণের ডাইমেনশান-বোধ, নাটকের চরিত্র-অনুযায়ী মঞ্চসজ্জা ও অন্যান্য প্রয়োগপদ্ধতি।

এই সময় বলিস্লাভস্কির পরিচালনাধীন পর পর দুটি নাটকে আমি তাঁর প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। ব্রডওয়ের বিখ্যাত-

প্রযোজক উইনথ্রপ এম্‌স যখন 'মিকাডো' নামে মঞ্চসফল নাটকটিকে চলচ্চিত্রে আকার দিতে চাইলেন, তখন তিনি বলিস্লাভস্কির স্মরণাপন্ন হলেন। আমেরিকার স্টুডিও-জগতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সহযোগে এই চলচ্চিত্রটি রূপায়িত হওয়ার কালে বলিস্লাভস্কি আমাকে সরাসরি সহযোগী পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করেন। পূর্বতন অভিজ্ঞতা ছাড়া এ কাজ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হতো, যদি না তিনি সদাসর্বদা আমার প্রতিটি প্রয়াসের পেছনে উপস্থিত থাকতেন ও প্রেরণা যোগাতেন। আমাদের সৌভাগ্য, 'মিকাডো' ছবিটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ সময় তদানীন্তন বেশকিছু প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়। অন্যান্যদের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে মেরি পিকফোর্ড, চার্লি চ্যাপলিন ও ডগলাস ফেয়ারব্যাংক্‌স-এর কথা।

আর একটি স্মৃতি এই বৃদ্ধবয়সেও আমার অন্তরে অমলিন হয়ে আছে। তা হল সে সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে বন্দিতা সারা বার্নার্ড-এর অভিনয় স্বচক্ষে দেখার অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

শুনতে পেলাম সারা আসছেন অফিয়ুম ভডেভাইল থিয়েটারে অভিনয় করতে। জীবিত অবস্থাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত-হওয়া অভিনেত্রীকে দেখার জন্য থিয়েটারের দরজায় সমস্ত নিউইয়র্ক ভেঙে পড়ল।

সারা-র বয়স ও অভিনয়-ক্ষমতা তখন পশ্চিমগামী। তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও সেই দুর্বলতা তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছিলেন তিনি, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করাও বেশ একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল তাঁর পক্ষে। হয়তো তাঁর অন্তিম পর্যায়ের অভিনয় দেখে তাঁকে বিচারের চেষ্টা কিছুটা হঠকারিতারই নামান্তর।

তবু যখন সারা লস্ অ্যাঞ্জেল্‌স-এ এলেন, পরপর কয়েকটি রজনী পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ালেন, স্পষ্ট অনুভব করলাম, বয়স ও আসন্ন মৃত্যু তাঁর প্রতিভাকে রাহুগ্রস্ত করতে পারেনি।

আঁফয়্মে তাঁর সহঅভিনেতা-অভিনেত্রী প্রত্যেকেই ছিলেন সুদক্ষ নট-নটী। সারা মঞ্চে প্রবেশ করার আগে একজন সুদর্শন তরুণ অভিনেতা অসামান্য অভিনয় করছিলেন এবং দর্শকদের একেবারে সম্মোহিত ক'রে ফেলেছিলেন। আমি ভাবছিলাম, বৃদ্ধা সারা কিভাবে এই তরুণের অভিনয়কে অতিক্রম ক'রে দর্শকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন!

তখনই মঞ্চের একেবারে বাঁ দিক থেকে বিনা আড়ম্বরে বিনা ভূমিকায় প্রবেশ করলেন সারা বার্নার্ড। কোনো আলোর বৃত্ত গিয়ে তাঁকে উইংস-এর ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এলো না।

সারা একটি বিরাট পিয়ানোর ওপর রক্ষিত এক বাস্কেট সাদা ক্রিসানথিমামের পিছনে এসে মন্থর পায়ে দাঁড়ালেন এবং শান্তভাবে ফুলগুলি সাজাতে লাগলেন। তাঁর নিজের হাতে আরও কিছু ফুল ছিল, সেগুলিকে ভেতরে ভেতরে গুঁজে দিলেন। সারা ঘরে বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো মৃদু আওয়াজ হল এবং মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ানো ঐ তরুণ যুবাপুরুষকে ছেড়ে দর্শকদের দৃষ্টি সারা-র প্রতি নিবদ্ধ হল। তিনি ঐ অভিনেতা বা অন্য কোনো চরিত্রের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না ক'রে আশ্চর্য মনঃসংযোগের মাধ্যমে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। যখন ফুল সাজানো শেষ হল, তিনি ধীর পায়ে একটু কোনাকুনি-ভাবে মঞ্চের সামনের দিকে হেঁটে এসে আগুনের চুল্লির পাশে রক্ষিত একটি আর্মচেয়ারে বসলেন। এমনভাবে আগুনের দিকে তিনি ঝুঁকে তাকিয়ে রইলেন যে মনে হচ্ছিল শীর্ণ, অশক্ত শরীরকে চাঙা ক'রে তোলার জন্য চুল্লির সমস্ত উত্তাপ তিনি চোখ দিয়ে শুষে নিচ্ছেন। একবার, এবং একবারই মাত্র ঐ প্রগলভ তরুণ অভিনেতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সে দৃষ্টিতে গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। তারপর নিঃশব্দে তিনি একই সঙ্গে তরুণটির কথা শুনতে লাগলেন ও তাঁর ছোট্ট, সুন্দর হাতদুটি উলটে-পালটে চুল্লিতে সেঁকতে প্রবৃত্ত হলেন। তরুণের কোনো কোনো উক্তিতে তাঁর দৃষ্টি ও ঠোঁটের রেখার সামান্য পরিবর্তন ঘটছিল, এবং অধিক কোনো চাঞ্চল্য ছিল না।

অভিনেতাটির দীর্ঘ সংলাপ শেষ হলে আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

তিনি ঠাণ্ডা, নরম গলায় কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলেন। তাঁর স্বরনিক্ষেপণের মধ্যে কোনো বাহাদুরি বা কুস্তির প্যাঁচ ছিল না। এক গভীর বিষন্নতার একেবারে বুকের ভেতর থেকে সে কণ্ঠস্বর বাষ্পের মতো বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে সারা হল আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। তাঁর প্রায় কথাই আমি অনুধাবন করতে পারি নি, কিন্তু বিনা দ্বিধায় অনুভব করেছিলাম যে আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সামনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছি। আমার শিক্ষিকা মাদাম উস্‌পেনস্কায়া অভিনয় শিক্ষাদানের সময় যে কেন 'নৈঃশব্দ্যের ভাষা'-কে অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন, সারা বার্নার্ড-এর অভিনয় দেখে তার তাৎপর্য আমি গভীরতমভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম!

১৯২৮-এর প্রথম দিকে আমাকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের পদে উন্নীত করা হল। একদিকে ইন্‌স্টিট্যুটে শিক্ষকতা অন্যদিকে ল্যাবরেটরিতে থিয়েটারের মঞ্চ ও আলোকসজ্জার ভার গ্রহণ—এই উভয় গুরুদায়িত্ব আমাকে বহন করতে হচ্ছিল। এই সময় চেখভের 'থ্রি সিস্টার্স', 'আঙ্কল ভানিয়া', তলস্তয়ের 'রেসারেকশন', 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস', মেটারলিংকের 'ব্লু বার্ড', শেক্‌সপিয়রের 'মিড সামার নাইট্‌স ড্রিম', জাঁ জাক বার্নার্ড-এর 'দি সালকি ফায়ার' ইত্যাদি নাটকে আমার ভূমিকা ছিল প্রয়োগপ্রধানের। ব্রডওয়ের নাট্যজগতে ক্রমশ আমার পরিচিতি প্রসার লাভ করছিল।

বৃত্তের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছিল। থিয়েটার গিল্ড ও সিভিক রেপের্টোরি থিয়েটারের মহড়া দেখতে যেতাম প্রায়ই। আমেরিকার নাট্য-আন্দোলনের নবতরঙ্গে এই থিয়েটার দুটির অবদান অসাধারণ। দুটি থিয়েটারেরই জন্ম গ্রিনিচ গ্রামে—যে গ্রামটিকে আমেরিকার শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-লেখকদের মক্কা বলা হতো। শুনেছি, আজও হয়।

এই থিয়েটার দুটিতে রূপক ও সংকেত-নাটক অভিনয়ের নিরন্তর নিরীক্ষা চলত। স্মরণযোগ্য যে থিয়েটার গিল্ড-ই আমেরিকায় প্রথম ইউজিন ও'নিলের নাটক ও সিভিক রেপের্টোরি থিয়েটার প্রথম বার্নার্ড শ-এর নাটক মঞ্চস্থ

করেছিল। এই থিয়েটার দুটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈপ্লবিক। 'বৈপ্লবিক' কথাটাকে অবশ্যই আমি শিল্পগত অর্থে এখানে ব্যবহার করছি। যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এই সংস্থা দুটির প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতৃবর্গ সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এর জন্য এঁদের চলতি ধারার বিরুদ্ধে কম লড়াই করতে হয় নি—স্থূল, পরিহাসপ্রিয় ও পুরনো নাট্য-রীতিতে আস্থাবান মার্কিন দর্শকদের সামনে একটির পব একটি দুঃসাহসী নাটক প্রযোজনা ক'রে এঁরা চ্যালেঞ্জের দস্তানা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ইভা লা গ্যালিয়নের পরিচালনায় সিভিক রেপের্টোরি থিয়েটারে যখন বার্নাড শ-র বহু-বিতর্কিত 'মিসেস ওয়ারেন্‌স প্রফেশন' নাটকটি অভিনীত হয়, তখন মার্কিন নাট্যরসিকসমাজে একই সঙ্গে চরম প্রতিকূল মনোভাব ও তীব্র ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়।

ইউজিন ও'নিলের 'মোর্নিং বিকাম্‌স ইলেক্‌ট্রা'-র মহড়া যখন থিয়েটার গিল্ড-এ চলছিল, সেই সময়ই ঐ যশস্বী নাট্যকারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়। নাটকটি পরিচালনা করছিলেন রুবেন মেমোলিয়ন। ইউজিন এককোণে একটি টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্বাকভাবে মহড়ার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। দেখছিলাম, অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে তিনি অভিনেতাদের প্রতিটি চলাফেরা ও সংলাপ-উচ্চারণ নজর করছেন। সম্ভবত দ্বিতীয় অঙ্কের একটি দৃশ্যের মহড়া চলাকালীন 'না, না, এ হতেই পারে না' বলে আত্মবিস্মৃত ইউজিন হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলেন। অভিনেতৃবর্গ একেবারে তটস্থ। পরিচালক রুবেন ইউজিনের কাছে ছুটে এসে প্রাণপণে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে অভিনয়ের প্রয়োজনেই ঐ দৃশ্যের ঘটনা ও সংলাপ কিছুটা পাল্‌টাতে হয়েছে। রুবেন-এর বক্তব্য আমার কাছে যথেষ্ট বাস্তব ও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ইউজিন কিছুতেই তাঁর যুক্তি মানতে নারাজ। দুজনের প্রচণ্ড কথাকাটাকাটি শুরু হল। শেষে ইউজিন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে তাঁর নাটকের যদি একটি সংলাপ-ও পরিবর্তন করা হয়, তা হলে স্ক্রিপ্ট নিয়ে চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে তিনি সোজা থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবেন। বাধ্য হয়ে নাট্যকারের ইচ্ছাকে

মেনে নিতে হল বুবেন্-কে। এমনই একগুঁয়ে, জেদি ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও'নিল।

নাটক পরিচালনা ও প্রযোজনার বাঁধাধরা ছকের বাইরে যে নতুনত্বের সঞ্চার থিয়েটার গিল্ড করেছিল, তা আমার মতো অন্যান্য থিয়েটারের তরুণ অভিনেতা ও প্রয়োগবিদ্‌দেরও যথেষ্ট আকৃষ্ট করত। মার্কো পোলো-র জীবনী অবলম্বনে বুবেন মেমোলিয়ন যখন 'মার্কোস মিলিয়ন্‌স' নামে ও'-নিলের একটি নাটক পরিচালনা করছিলেন, তখন সেই নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের জন্য তিনি আমাকে নির্বাচিত করেন। ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস-এ আমার কাজের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে বুবেনের মতো চিন্তাশীল ও অভিনবত্বে বিশ্বাসী পরিচালকের সঙ্গে কাজ করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলাম।

আমেরিকার অন্যান্য থিয়েটারের কাজ-কর্ম দেখারও প্রত্যক্ষ সুযোগ আমার হয়েছিল এ সময়। আসলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারেরই অভিনয় থেকে মঞ্চকৌশলের নিজস্ব চরিত্র আছে। হাতে-কলমে ভালোভাবে কাজ শিখতে হলে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈচিত্র্যও আনা প্রয়োজন—এই সত্য উপলব্ধি করতে আমার অসুবিধে হয় নি।

আমাদের থিয়েটারে প্রথমে শিক্ষার্থী ও পরে একজন সফল অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান হেগেন নামে এক বিত্তবান যুবক। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত ভ্রমণকেন্দ্র রিপ ভ্যান উইনক্ল হিল্‌স-এ আমরা দুজন মিলে একটি বাংলো ক্রয় করেছিলাম। সাধারণত শনিবার সেখানে চলে যেতাম, সোমবার ভোরবেলা আবার সেখান থেকে রওনা দিতাম। এই স্থানটির অপর নাম ছিল উডষ্টক হিল্‌স। ভারি সুন্দর, মনোরম জায়গা। বহু পরিব্রাজক ও নিউইয়র্কবাসী ছুটিতে এখানে বেড়াতে আসতেন। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির গ্রীষ্ম-আবাস ছিল এখানে।

প্রধানত আমার ও হেগেনের প্রচেষ্টাতেই এখানে একটি পরীক্ষামূলক

নাট্যশালা গড়ে ওঠে। এটির নামকরণ করা হয় উডস্টক প্লে-হাউস। ল্যাবরেটরি থিয়েটারে সম্পূর্ণ ইচ্ছামতো কাজ করার সুযোগ আমাদের 'ছিল না। পূর্ব নির্দিষ্ট এক কঠোর শৃঙ্খলা ও রীতিমাফিক চলতে হতো। নিজেদের মাথায় নানা পরিকল্পনা আসত, নতুন ধরনের নাটক প্রযোজনা ও মঞ্চসজ্জা পরিবেশন করার ইচ্ছে হতো। সেই তাগিদ থেকেই নিজেদের মতো করে আমরা উডস্টক প্লে-হাউস গড়ে তুলি। ক্রমে ক্রমে থিয়েটার ইনস্টিট্যুট ও ল্যাবরেটরি থিয়েটারের অনেকেই আমাদের এই অভিনব প্রয়াসকে সফল করতে এগিয়ে এসেছিলেন। গরমের ছুটিতে সপ্তাহে চার দিন অভিনয় হতো এখানে। প্রেক্ষাগৃহ প্রায় সময়েই পরিপূর্ণ থাকত। আমেরিকার বড় বড় দৈনিকগুলিতে আমরা এভাবে বিজ্ঞাপন দিতাম ঃ

> Nine o'clock being the social howr that it is in Woodstock, it is important that milady should be well groomed for the occasion. Ladies, don't wear tight bodiees, because a sneeze might be fatal.

SPECIAL ANNOUNCEMENT

THE WOODSTOCK PLAYHOUSE

In association with

THE AMERICAN LABORATORY THEATER

Will give performances

Every

THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY

and

SUNDAY EVENINGS

at

NINE O'CLOCK

Tickets : $ 1·00

উডস্টকে নাট্যাভিনয় আমাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল'। মহৎ প্রয়োগ-শিল্পের আন্তর্জাতিক রূপরেখাটিকে উপলব্ধি করার গভীরতর আগ্রহ বোধ করছিলাম। ল্যাবরেটরি থিয়েটার থেকে একবছরের ছুটি নিয়ে এক সন্ধ্যায় বার্লিন অভিমুখে রওনা হলাম।

বহুদিন ধরে জগৎবিখ্যাত ম্যাক্স রাইনহার্ড থিয়েটারের খ্যাতি শুনে আসছি। হলিউডের চলচ্চিত্র-সংস্থাগুলি তাঁদের নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষভাবে তালিম দেওয়ার জন্য রাইনহার্ড থিয়েটারে পাঠাতেন। চার্লি চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রের নতুন নায়ক-নায়িকাদের কাছে তো এখানে অন্তত বছরখানেক শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

ম্যাক্স রাইনহার্ড আন্তর্জাতিক নাট্য-আন্দোলনে যে ধারাটির জন্ম দিয়েছিলেন, তার নাম সামরিকবাদ। সৈন্যসুলভ শৃঙ্খলার মাধ্যমে দ্রষ্টব্য প্রতিটি জিনিসকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ক'রে দেখানোই ছিল তাঁর রীতি। তিনি যে নাটকগুলি নির্বাচিত করতেন, চরিত্রে সেগুলি হতো কলোসাস। কোনো ধোঁয়াটে ভাব বা অস্পষ্টতা তিনি পছন্দ করতেন না। বড় বড় বিষয় নিয়ে কাজ করতেন তিনি। এক কথায় বলা যায় তাঁব নাট্য-প্রয়োগে শৃঙ্খলা ছিল ময়দানবের সৃষ্টির শৃঙ্খলা। জার্মান জাতির চরিত্রের মধ্যে একই সঙ্গে গভীর মননশীলতা ও গঠনক্ষমতার যে মিশ্রণ দেখা যায়, তারই উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে উঠেছিল রাইনহার্ড থিয়েটার। হিটলারের ভাষায় বলা যায়, রাইনহার্ড স্বভাবে ও আভিজাত্যে ছিলেন পুরোপুরি 'নর্ডিক টাইপ'-এর মানুষ।

আমি যখন বার্লিনে যাই, তখন রাইনহার্ড থিয়েটারে 'দি মিরাক্‌ল' নামে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। এই নাটকে নায়কের অভিনয় ক'রে মরিস গেস্ট নামে এক স্লাভ তরুণ প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ড-এর সঙ্গে তাঁর চেহারার আশ্চর্য মিল ছিল। পরবর্তী কালে মরিসের সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলস-এ আবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসের স্বনামধন্য নট।

রাইনহার্ড থিয়েটারের চরিত্রের ঠিক বিপরীত রূপ দেখেছিলাম ফ্রান্সে জাক কোপো (Copue)-পরিচালিত নাট্যাভিনয়ে। ফরাসি গীতিকবিতা ও

গীতিনাট্যের রূপতন্ময়তা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সূক্ষ্ম অনুভূতিমালাকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতে জাক কোপো-র অক্লান্ত প্রয়াস ছিল। তাঁর পরিচালিত অধিকাংশ নাটকই ছিল রূপক এবং সংকেত-নাট্য। বদলেয়র থেকে শুরু ক'রে মালার্মে পর্যন্ত ফরাসি কবিদের কবিতায় যে ভাবঘন আত্মমুখিনতা ছিল, কোপো ছিলেন সেই প্রবাহের নাট্য-ভগীরথ। প্রতীকী মঞ্চসজ্জা, কুয়াশাস্তীর্ণ, মৃদু বর্ণালি প্রক্ষেপণের ভেতর দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের সামনে তিনি এক ইন্দ্রিয়াতীত লোকের দুয়ার খুলে দিতেন। কোপো-পরিচালিত নাট্যাভিনয়ের আবেদন ছিল আত্মিক ও কাব্যধর্মী। বিশ্বনাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁকে 'স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম'-এর প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে।

১৯২৮, '২৯ ও '৩১ সনে মস্কো যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিপ্লবোত্তর রাশ্যায় নাট্য-প্রযোজনার চরিত্র ও বিষয়বস্তু যদিও সাধারণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, তবু মস্কো আর্ট থিয়েটার ও বলশয় থিয়েটারের ঐতিহ্য মোটামুটি বজায় ছিল। ব্যালে নৃত্যের জন্মভূমি রাশ্যা। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ব্যালে ও অপেরা-প্রদর্শনী আমার মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিলেন খ্যাতনামা নাট্যপরিচালক মেয়ারহোল্ড। তাঁর পরিচালনায় পুশকিন-অবলম্বনে প্রযুক্ত অপেরা, চেখভ ও ম্যাক্সিম গোর্কি-র কয়েকটি নাটক দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। রাশ্যার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এককথায় অসাধারণ। অভিনয় ছিল তাঁদের রক্তে। তাঁদের অভিনীত নাটক দেখেই বুঝেছিলাম যে নিউইয়র্কের তরুণ-তরুণীদের দিয়ে চেখভ অভিনয় করানো কি পণ্ডশ্রম! দলগত অভিনয় বলতে কি বোঝা যায় মেয়ারহোল্ড-পরিচালিত গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ' দেখার পূর্বে সে সম্পর্কে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ, চলাফেরার ওপর এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর ও সমান গুরুত্ব দিতে আমি মেয়ারহোল্ডের পূর্বে আর কোনো নাট্যপরিচালককে দেখি নি। যে সমষ্টি-অভিনয় সমাজতান্ত্রিক ধারার নাট্য-প্রযোজনার সম্পদ, তা প্রথম মেয়ারহোল্ডের হাতেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

যাঁকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম নাট্যপরিচালক বলে শ্রদ্ধা নিবেদন

করা হয়, সেই স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে অবশ্য রাশ্যায় আমার সাক্ষাৎ হয় নি। তঁারই সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন আমার আচার্য বলিস্লাভস্কি—তঁার কাছ থেকে ঐ অমর রূপকারের সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও প্রয়োগ-দক্ষতা সম্পর্কে এত কাহিনী শুনেছিলাম যে, তিনি আমার স্বপ্নের পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে রাশ্যা থেকে ফেরার পথে শুনলাম তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এক আরোগ্য-নিকেতনে আছেন। অধীর আগ্রহে ছুটে গেলাম। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে একটি ডিভানের ওপর শুয়ে ছিলেন তিনি। তখন তঁার চলৎশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বলিরেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাটে অস্তগামী সূর্য ও আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। শ্বেতশুভ্র অবিন্যস্ত শ্মশ্রু বুক ছাপিয়ে নেমে এসেছে। মাত্র মিনিট পাঁচেকের জন্য তঁাকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছিলাম। ঐ অল্পসময়ের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে তিনি তঁার শিষ্য-শিষ্যাদের সম্পর্কে আমাকে দু-একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

বৃটেনে গিয়েছিলাম গর্ডন ক্রেগের কাজ দেখতে। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট সদয় আচরণ করেছিলেন; এমনকি তঁার পরিচালিত নাটকের মহড়া দেখার দুর্লভ সুযোগও দিয়েছিলেন। মানুষের জায়গায় মঞ্চে বস্তুকে উপস্থাপন ক'রে সেগুলির মধ্যে মানবিকতা আরোপ করার অত্যন্ত দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন ক্রেগ। বিরাট বিরাট সেট নিয়ে কাজ করতেন তিনি। যন্ত্রযুগের চরিত্রকে ধরতে ক্রেগ বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সাধারণভাবে তঁার রীতিকে ব্লক থিয়েট্রিকাল রীতি নামে আখ্যা দেওয়া হতো। আপসহীন ব্যক্তিত্বে ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ক্রেগ ছিলেন ইয়োরপীয় নাট্যজগতের সবচেয়ে বিতর্কিত পুরুষ।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নাট্যমন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসে আমি আবার ল্যাবরেটরি থিয়েটারের কাজে মন দিই। আমার অবস্থা তখন ক্ষুধায় ব্যাকুল তরুণ বৈনতেয়-নন্দনের মতো। বিভিন্ন নাট্যধারা তখন আমার চিন্তায় সংঘাত সৃষ্টি করছে, অথচ সমীকরণের স্থিতি লাভ করে নি। এই সময় আমি প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক ওয়াল্টার হ্যাম্পডেনের সঙ্গে 'Light of Asia' এবং রবার্ট এডমণ্ড জোন্‌স ও চ্যানিঙ পোলকের সঙ্গে 'Mr. Money Penny'

ভূখণ্ডে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে। ল্যাবরেটরি থিয়েটারের জনৈক ছাত্রের সহায়তায় এই সময় আমার সঙ্গে আমেরিকার সবচেয়ে খ্যাত ইমপ্রেসারিও শ্রীমতী এলিজাবেথ মারবারি-র সঙ্গে যোগাযোগ হয়। শ্রীমতী মারবারি ছিলেন মার্কিন সংস্কৃতিজগতের একেবারে উঁচুতলার মহিলা। তাঁর সংযোগ ছিল অসাধারণ। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংস্থা, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের তিনি বারবার আমেরিকায় এনে জড়ো করেছেন। তিনি যে-সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন, সেটির নাম ফিলাডেলফিয়া গ্যারান্টি ট্রাস্ট।

কলকাতার নট ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ী-র খ্যাতি তখন মধ্যগগনে। ভারতীয় নাট্যমঞ্চের এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতিভার কিছুটা পরিচিতি মার্কিন ও ইয়োরোপীয় নাট্য-পিপাসুরা যাতে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য আমি বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলাম। এখানে শিশিরকুমার ও তাঁর দলের আগমন এবং তাঁদের কয়েকটি নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না তা জানতে চেয়ে আমি বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম। এ বিষয়ে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও *পরিচালক এরিক এলিয়ট। কলকাতার থিয়েটার সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট* ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং আমার মতো তিনিও ছিলেন শিশিরকুমারের গুণমুগ্ধ ভক্ত।

এলিজাবেথ মারবারি আমার চিঠির উত্তর দিলেন ও শিশিরকুমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করলেন। তিনি তখন রীতিমতো বৃদ্ধা। হাঁটতে পারেন না। হুইল-চেয়ারে চলাফেরা করেন। কিন্তু তাঁর মাথা ছিল অত্যন্ত সাফ এবং তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী। ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে কঠোর বাস্তববাদের জন্ম দিয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পর বিস্তারিত জানতে চেয়ে তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতেই তাঁর বাস্তববুদ্ধির স্বচ্ছ পরিচয় পাওয়া যায়:

March 25, 1929

Mr. Satu Sen
The American Laboratory Theater
222 East 54 Street
New York City.

Dear Mr. Sen,

I was serious yesterday when I wanted you to write out at once to Calcutta to get all the advance information you can. Here are the questions I would like to have answered.

1. How many people actually would be needed to bring over here ?

2. Can vou get the great actor to whom you referred ?

3. What is the fare from Calcutta to New York ? This is a serious consideration.

4. Would they bring all of their properties, draporics and costumes ?

5. How many plays, modern and classic, would they have in their repertoire ?

6. Could they arrive here about November first ? How many weeks could they remain ?

7. What would be the total cost of salaries for the company, including the star ?

You must remind them that there is a risk in bringing them over the first year, and that their terms would have to be moderate so far as salaries are

concerned, as the expenses would be very heavy.

As soon as you hear, let me know.

Cordially yours,

Elisabeth Marbury

শিশিরকুমারকে আমি একটি চিঠি ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম। তেসরা এপ্রিল তিনি আমাকে কেব্‌ল করেন: 'Porposal Acceptable. Kindly Write Details. Company Ready Musical Comedy Variety Turns etc. Cable What Accepted.'

ইতিপূর্বে পয়লা এপ্রিল শ্রীমতী মারবারি এ বিষয়ে ও শিশিরকুমার সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রে আমাকে আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। ত'ার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই সম্ভাব্য চুক্তির শর্তাবলি জানিয়ে শিশিরকুমারকে আমি কেব্‌ল করেছিলাম।

আটই এপ্রিল শ্রীমতী মারবারি আমাকে নিচের চিঠিটি লেখেন:

April 8. 1929

Dear Mr. Sen.

If we are going ahead with the matters that interest me, we must proceed in a very business-like fashion. You can not cover these things by cables, so you must write to Sisir Bhaduri fully and find out in detail exactly what business arrangements can be made. I think that you have set thair salaries high. Whatever they get in India should merely be added to pro rata. If you will find out what the salaries are in Calcutta, I can then make an additional offer. I want to know exactly what plays they can bring and what equipment we can be sure of. I would not want them here before the first of November.

I also want all the press clippings in English

that you can gather. If they have any circulars or photographs, send to them for these. I also must be sure that they can give their plays in English. This will make an enormous difference.

Sincerely yours,
Elisabeth Marbury

শ্রীমতী মারবারির অজ্ঞাত ছিল যে ইতিমধ্যেই আমি তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে শিশিরকুমারকে একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত পত্র দিয়েছিলাম। তাঁর বিভিন্ন নাটক সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের যাবতীয় সমালোচনার কপি চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে আমি শিশির-কুমারকে জানাই যে তাঁর দলের নিজস্ব পোশাক, দৃশ্যপট ও অভিনয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কলকাতা থেকে নিয়ে আসতে হবে। জানিয়েছিলাম, তাঁকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছতে হবে এবং এখানে তিনি যেসব নাটক মঞ্চস্থ করতে চান, সেগুলির কোনো কোনোটির ইংরিজি অনুবাদ ক'রে আনতে হবে। শ্রীমতী মারবারির ইচ্ছা ছিল, যাতে শিশিরকুমারের দলে একজন উচ্চস্তরের নৃত্যশিল্পী ও বেশ ভালো একটি নৃত্যের দল থাকে। সে কথাও উক্ত পত্রে আমি তাঁকে জানাই। আমি শিশিরকুমারকে দীর্ঘমেয়াদি উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপ্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করি ও সরাসরি জানতে চাই যে তিনি আদৌ আসতে প্রস্তুত কি না।

শ্রীমতী মারবারি-র অপর একটি অভিলাষ ছিল নিউইয়র্কে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করা। সে সম্পর্কেও তিনি আমাকে বারবার চিঠি লেখেন। আমি তাঁর অনুরোধ মহাত্মাকে লিখিত আকারে জানাই। তখন ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। মহাত্মাজী আমাকে জানান যে ঐ বিষয়ে যা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার, তা অধিবেশনের শেষে কংগ্রেস কর্মপরিষদের সভাতেই গৃহীত হবে। দুর্ভাগ্যবশত শেষপর্যন্ত আমার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কানাডায়। তিনি ইম্পিরিয়াল এডুকেশন

কনফারেন্সে এসেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী মারবারি কখনোই আমার এ সম্পর্কিত পুনঃপুন প্রস্তাবে আগ্রহ দেখান নি।

আবার শিশিরকুমারের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শ্রীমতী মারবারির আমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ দিয়ে তিনি আমাকে একটি চিঠি দেন। তাঁর পাঠানো কেব্‌ল-এর চারদিন পরই চিঠিটি এসে পৌঁছয়। পত্রপাঠ আমি তাঁকে নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি জানাই ঃ

American Laboratory Theater
April 10th, 1929

Dear Mr. Bhaduri.

I received your cable in due time—I am glad to know that you can come. I didn't want to write to you any detailed letter unless I knew you could come at all.

I have been asked to negotiate with you by one of the most prominent persons of New York society. She is intersted in bringing over an Indian company here next winter and I suggested you.

Now I would like to give you an idea of the type of plays she would like you to have in your repertoire—she would .like you to have about six plays in your repertoire, a mixture of Classical, Epical, Fantasy, Opera and modern plays—choice of that depends entirely upon you, what want is you at your best.

The whole programme has to be the best of its kind. You must realise that you have as your competitors companies like Moscow Art and Max Rhinhardt. If I didn't have the faith in you, I wouldn't suggest your name for such an adventure which would cost Miss Marbury such a tremendous amount of money.

Three of your plays have to be English (I don't mean western plays), of course that will be quite easy. Also try to get a very good dancer in your company who can be used for recitals.

You will have to bring your costumes, properties and sceneries.

The company will have to reach New York about the first week of November or December. We also want to know how long can we keep you here. She intends to have to here in New York and probably in few other cities.

Now let us talk finance. We pay all your transportations from Calcutta to New York and back second class and for all other inland tours here. As regards weekly salaries it has to be very liberal as there is a great risk in bringing the company over first year, as the expenses here will be very heavy, as the publicity and other expenses will be tremendous. So we would like to konw what you would like to have for your company of a about fifteen.

If I may say so you couldn't be introduced to this country better through anybody else because of Miss Marbury's various connections—social, political, literary and professional.

As soon as you get my letter please send me all the materials that can be used for publicity purposes.

Hope we can came to some terms as I believe that this is a great thing for both Indian and American theatre.

When we meet I will be glad to renew our old friendship. My best regards and good wishes for the great work you are doing for the Indian theatre.

Cordially yours,

Satu Sen

আমি একই সঙ্গে আশায় ও উদ্বেগে দিনযাপন করছিলাম। স্পষ্ট বুঝা পারছিলাম যে এক প্রচণ্ড দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। একবার মনে হচ্ছি যদি শিশিরকুমারের দল এখানে মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করে, তাহলে ভারতে নাট্য-আন্দোলনে এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ হবে। তারই পাশাপাশি আশঙ্ক ছিল কম নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক স্তানিস্লাভস্কি একসম তাঁর অজেয় মস্কো থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে আমেরিকার বুকে দিগ্বিজয়ের র চালিয়ে গেছেন। তখনও প্রতি একবছর অন্তর নিয়মিত তাঁর কুশীলবদে নিয়ে আমেরিকায় আসতেন ডাকসাইটে জার্মান পরিচালক ম্যাক্স রাইনহার্ড এসেছেন দলবলসমেত জাক কোপো, গর্ডন ক্রেগ প্রমুখ মহান নাট্যশিল্পী আমেরিকার নাট্যামোদী দর্শক ও সমালোচকদের তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অভিভূ ও আচ্ছন্ন ক'রে রেখে বিশাল বিত্ত অর্জন ক'রে দেশে ফিরে যেতেন। এ পটভূমিতে একটি ভারতীয় নাটকের দলকে এদেশে আনার প্রয়াস তো দূরে কথা, চিন্তা প্রকাশ করাই অনেকের কাছে দুঃসাহস বলে নিন্দিত হ পারত।

আমি শিশিরকুমারকে অন্তত ছ'টি নাটক ভালোভাবে প্রস্তুত ক'রে নি আসতে অনুরোধ করেছিলাম—একটি ঐতিহাসিক, তিনটি পৌরাণিক, একা ফ্যান্টাসি অথবা অপেরা এবং একটি আধুনিক সমস্যামূলক নাটক। বল বাহুল্য, তাঁর মতো মহান অভিনেতা ও পরিচালকের ওপর আমার ব্যক্তিগ মতামত চাপিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না, তবু অত্যন্ত কুণ্ঠার সা আমার কলকাতায় থাকাকালীন দেখা তাঁর দুটি নাটকের নাম আমি উল্লে করেছিলাম। একটি 'সীতা' ও অপরটি 'আলমগীর'।

নিউইয়র্কের নাট্যামোদীদের পক্ষপাত ছিল গীতিবহুল, রোমান্টিক বীররসাত্মক নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি। তা ছাড়া বিভিন্ন আগন্তুক দলের এব উচ্চস্তরের নাট্য-প্রযোজনা দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে পোশাক, অভিনেতৃবর্গ, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ের মান একেবারে প্রথম শ্রেণী না হলে তাঁদের মনোরঞ্জন হতো না। অথচ কলাকৌশলের দিক থেকে ভারতীয় মঞ্চ তখনও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট অনগ্রসর।

আমি চেয়েছিলাম, অন্তত গোটা দুই নাটক যেন ইংরিজি ভাষায় অভিনীত হয়। শিশিরকুমারকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে তাঁর দল যেন এমনভাবে গঠিত হয়, যাঁদের সবাই ইংরিজি বলতে পারেন। এর প্রধান কারণ, আমার মাথায় পরিকল্পনা ছিল হলিউডের চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের ভারতীয় দলটির প্রতি আকৃষ্ট করা ও তাঁদের মাধ্যমে অন্তত একটি নাটকের চলচ্চিত্রে রূপায়ণ। আমি যদিও জানতাম যে প্রত্যেকটি ইংরিজিনবিশ অভিনেতাঅভিনেত্রীর চেয়ে আমি শিশিরকুমারের কাছে অসম্ভব দাবি করছি, তবুও কেন যেন আমার মনে হতো তিনি সমস্ত অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারঙ্গম।

শ্রীমতী মারবারি-র নির্দেশক্রমে আমি শিশিরকুমারকে এখানকার খরচ-পত্র সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলাম। তখন মোটামুটি ভালোভাবে থাকতে নিউইয়র্কে একজনের খরচ পড়ত সপ্তাহে ষাট ডলার। যদিও শিশিরকুমার প্রতিসপ্তাহে আমাদের কাছ থেকে ৩,৫০০ডলার দাবি করেছিলেন, আমরা জানিয়েছিলাম যে ২,৫০০ ডলারের বেশি দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনিতেই নিউইয়র্কে নাটক-পরিবেশনের খরচ প্রচণ্ড, তার ওপর আগন্তুক দলের যাতায়াত, মালের ভাড়া, অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচার এবং তার ওপর সপ্তাহে ২,৫০০ ডলার দিয়ে উদ্যোক্তাদের হাতে প্রায় কিছুই থাকার কথা নয়। তা ছাড়া একটি সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের দেশের নাটক-প্রদর্শনী সেখানকার দর্শকরা কিভাবে নেবেন, তা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল—বিশেষত যে দলের অভিনয় পূর্বে কখনও তাঁরা দেখেন নি। শিশিরকুমারকে আমি প্রায় প্রতি চিঠিতেই অনুরোধ করতাম, তাঁর দলের অভিনয় সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত ও আলোচনাদির কপি পাঠাতে। আমার দুর্ভাগ্য, কোনো সময়েই তিনি আমার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। অথচ ঐ বিষয়গুলি প্রচারাভিযানের জন্য আমাদের কাছে পৌঁছনো একান্ত জরুরি ছিল।

যদিও শ্রীমতী মারবারি এই যোগাযোগের ব্যাপারে আমার ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তবুও শিশিরকুমার ও তাঁর দলের অভিনয়ের মান

সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কলকাতাবাসী তাঁর পরিচিত দু-চার জনে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলছিলেন। যেহেতু এক প্রবা আর্থিক ঝুঁকি তাঁকে বহন করতে হবে, সেই কারণে তাঁর এ জাতীয় আচর আমার কাছে বিন্দুমাত্র আপত্তিজনক বলে মনে হয় নি। অবশ্য এগারোই ' '২৯-এ লিখিত তাঁর একটি পত্র থেকেই আমি এই তথ্য জানতে পারি শ্রীমতী মারবারি আমাকে লিখেছিলেন: 'I do not hear very goo reports of the Calcutta company. The people who have see them do not feel enthusiastic. However we shall see what th reaction is from your enquiries.'

শিশিরকুমার আমেরিকায় অভিনয় বাবদ যে আর্থিক দাবি জানিয়েছিলেন পূর্বেই বলেছি, তা আমাদের পক্ষে বহন করা নানা কারণে প্রায় অসম্ভ ছিল। বারবার সে-কথা আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁ দাবিতে অটল ছিলেন। শ্রীমতী মারবারি ক্রমশ দল সম্পর্কে তাঁর আকর্ষ হারিয়ে ফেলছিলেন। শিশিরকুমারের প্রস্তাবের অটলতা শেষপর্যন্ত তাঁবে এতদূর বীতস্পৃহ করে তুলল যে একুশে জুলাই লিখিত একটি চিঠিতে তিনি আমাকে সরাসরি জানালেন: 'I am sure that no manager woul assume such a heavy guarantee plus the terrible expense. I have been making enquiries and can not learn much about thi Calcutta company. I asked you some time ago to get me pres notices and some descriptions of their work. No manager would give a contract in the dark.' এই চিঠিতে তিনি অভিযোগ করলেন যে শিশিরকুমারকে লিখিত আমার চিঠিগুলি নাকি কখনোই স্পষ্ট ও ব্যবসায়িক বক্তব্য রাখে নি। এ কথাও তিনি জানালেন: 'My suggestion was only tentative. I would not be the manager, but if the terms and plans seemed in equity would have at once tried to get a contract for this company, acting as their agent.'

ক্রমশই বিষয়টি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার একটি চিঠিতে আমাকে জানালেন যে ২৯-এর নভেম্বর বা

ডিসেম্বর মাসে তিনি ও তাঁর দলের আমেরিকা সফরে আসা সম্ভব হবে না। সমস্ত ব্যাপার এক পরিপূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলে ছিল। আমি ব্যক্তিগত-ভাবে এই প্রসঙ্গে নিজেকে এত বেশি নিয়োজিত রেখেছিলাম যে ল্যাবরেটরি থিয়েটার বা ইনস্টিট্যুট—কোনটির কাজেই মন দিতে পারছিলাম না। রিপ ভ্যান উইনকল হিল্সের উডস্টক প্লে-হাউসটি তো একেবারে উঠে যাওয়ারই দাখিল হয়েছিল। এর ফলে আমার তদানীন্তন স্বচ্ছলতাতেও কিছু পরিমাণে ভাঁটা পড়েছিল।

শ্রীমতী মারবারি-র মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে আমি শিশিরকুমারের বন্ধু এরিক এলিয়টের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলাম ও তাঁকে নিয়ে মারবারির সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও করলাম। এরিক এলিয়ট স্বয়ং ব্রডওয়ে-র একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন এবং নাট্যরসিক মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কলকাতার পুরনো নাট্যামোদীদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে এলিয়ট বেশ কয়েকবার তাঁর দলবল নিয়ে ভারত-ভ্রমণ করেছিলেন ও প্রচুর খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর গোষ্ঠীর অভিনীত 'হ্যামলেট' 'ওথেলো' ও 'মারচেণ্ট অফ ভেনিস্' এবং বার্নাড শ-প্রণীত 'ক্যাপ্টেন ব্রাসবাউণ্ডস কনভারশান' প্রভৃতি নাটকগুলি কলকাতার রঙ্গমঞ্চে খুবই আদৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষে সফরকালীন শিশিরকুমারের সঙ্গে এরিক এলিয়টের যোগাযোগ হয় ও পরবর্তীকালে তা ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয়। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে এলিয়ট দয়ার্দ্র হয়ে ওঠেন ও স্বয়ং ঘটনামঞ্চে আবির্ভূত হন। তিনি আমাকে জানান, যেভাবেই হোক আগন্তুক দলের মার্কিন-সফর প্রসঙ্গে শ্রীমতী মারবারি-র নাম যুক্ত রাখতেই হবে। এলিয়ট আমাকে ব্রডওয়ের আর একজন খ্যাতনামা ইমপ্রেসারিও কার্ল রীড-এর কাছে নিয়ে যান এবং এলিয়টেরই প্রভাবে রীড শিশিরকুমারের সম্ভাব্য সফরে ম্যানেজার হতে রাজি হন। আমাদের পারস্পরিক কয়েকটি আলোচনার পর ঠিক হয় যে উদ্যোক্তা, পরিবেশক ও আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণকারী হিসাবে যথাক্রমে শ্রীমতী মারবারি, আমি ও এরিক এলিয়ট যৌথভাবে এবং কার্ল রীড থাকবেন।

এই আলোচনার পর এলিয়টের অ্যাটর্নি শিশিরকুমারকে নিম্নোক্ত চিঠিটি পাঠান :

July 14th, 1930

Dear Mr. Bhaduri,

I am sending you this letter through our mutual friends, Satu Sen and Eric Eliott, in explanation of the various agreements as to your American venture. Not that it is necessary, because I feel and believe that the agreements are explicit in themselves, but to reassure you that your interest have been well protected.

...Under your contract with Mr. Reed, all your passage money both to America and return, for you and your company is paid for and assured. You are given a minimum contract of four weeks engagement at a salary to you of $ 3,290 weekly, which you are to pay out to the remainder of your company in such sums as you and Eric see fit You are given three per cent of the box offices receipts, which should get you, conservatively speaking $ 450.00 per week,· taking my figures on a $ 15,000.00 week intake.

If, perchance—and the likelihood seems good—you are able to dispose of some of your plays to motion-picture interests, you are to receive fifty per cent therefrom and fifty per cent of all other revenue. You will notice that Mr. Reed has contracted for an option on your services for a period of four additional years. Both Eric and I have been very insistent than the options should be more remunerative that the present contract. Hence, you will

notice both an increase in guaranteed minimum, and also of salary list.

I might add that Miss Marbury receives ten per cent of your weekly salary only, that is, ten per cent of $3,290.00. She does not share in your percentage of box office receipts. However, should she be instrumental in obtaining other employment for you she is entitled to ten per cent thereof, which is the customary rate of commission in America.

I am anxiously awaiting your visit to America, and American people as I do, I can not help but feel that we shall have the pleasure of having you with us for many months to come.

Believe me to be,

Lewis M. Greene

এই চিঠিতে যে চুক্তিনামার উল্লেখ আছে, সেটি ম্যানেজার হিসাবে কার্ল রীড এবং নিজের ও দলের তরফ থেকে শিশিরকুমারের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিনামার বয়ান রচনা করেছিলেন ১৪৭২ ব্রডওয়ে, নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল হেনরি জে. ফ্যারেল। আমেরিকায় শিশিরকুমার-সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে মূল দলিলটি আমি অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষা করেছি।

চুক্তিটিতে প্রথমেই দু'টি স্বীকারনামা ছিল। প্রথমত শিশিরকুমার দীর্ঘ-কাল যাবৎ ভারতবর্ষে বিভিন্ন নাটক সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা, নির্দেশনা ও পরিচালনা করেছেন এবং নিজে ঐ নাটকগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। এর ফলে সারা ভারতে শিল্পী রূপে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত কার্ল রীড দীর্ঘদিন ধরে ব্রডওয়েতে বহু নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত করেছেন এবং প্রযোজকরূপে তাঁর বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত।

কার্ল রীডের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে একমাত্র এশিয়া মহাদেশ ভিন্ন আমেরিকা, কানাডা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ভারতীয় জীবন, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতিফলনকারী নাট্যাভিনয় পরিচালনা করার ক্ষমতা শিশির-কুমারকে দেওয়া হয়।

চুক্তির দুই নম্বর ধারায় বলা হয় যে ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর দল সমেত মোট বাইশ জনের যাতায়াত ভাড়া বহন করবেন। দলিলটিতে সর্বত্রই শিশিরকুমারকে শিল্পী এবং কার্ল রীডকে ম্যানেজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর স্ত্রী-র জন্য প্রথম শ্রেণী এবং দলের অন্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ-ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু এই দলটিকে দশই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমেরিকায় পৌঁছতেই হবে। ঠিক ঐ একই হাবে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আগন্তুকদের ভাড়া মেটানো হবে।

তিন নং ধারায় লিখিত ছিল যে সপ্তাহে কমপক্ষে আটটি প্রদর্শনী হবে এবং তার জন্য পারিশ্রমিকের হার সপ্তাহে ৩,২৯০ ডলার। যথেষ্ট সংগত কারণ ছাড়া যদি আগন্তুক দল আটটির অনধিক অভিনয় করে তবে আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক কাটা যাবে।

ধারা চার ও পাঁচ-এ বলা হয়, ম্যানেজার নিউইয়র্ক শহরের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর মণ্ডগুলিতে উপযুক্তভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন। শিল্পীর লিখিত অনুমতি ছাড়া তিনি কোন নাটকেরই পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন না। শিল্পীকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে নিউ-ইয়র্কে পৌঁছনোর দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁর ও তাঁর দলের প্রথম প্রদর্শনীর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। অভিনেয় নাটকগুলির সর্বস্বত্ব শিল্পীরই থাকবে।

আট নং ধারায় শিল্পীকে সতর্ক ক'রে বলা হল যে রূপসজ্জা, পোশাক ও দলগত অভিনয়ের উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁকে কঠোর নজর রাখতে হবে এবং তিনি উল্লিখিত ম্যানেজার ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কর্পোরেশন, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের সঙ্গে প্রদর্শনীর বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না।

দশ নং ধারায় অভিনয়ের পূর্বে যথাযোগ্য বিজ্ঞাপন ও সেই বিজ্ঞাপনে

শিল্পীর নাম ও পরিচয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করার দায়িত্ব ম্যানেজারকে দেওয়া হয়। বলা হয়, সফরকালে তিনি সবসময় শিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর জন্য প্রথম শ্রেণীর ও অন্যান্য শিল্পীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল, আবাসস্থল, আহার, পানীয়, যানবাহন ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুত থাকবেন।

আমার কাছে খুবই বিচিত্র লেগেছিল চুক্তির বারো নং ধারার বয়ান। এখানে বলা হয়েছিল, শিল্পী ও তাঁর দলকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা তাঁদের জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের ধারাকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করছেন! কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দর্শক কিভাবে ভারতীয় শিল্পীদের অভিনয়ের খোলসের ভেতর থেকে ভারতীয়ত্বের শাঁসটুকু বের ক'রে নিতে পারবেন, সে সম্পর্কে অবশ্য কোনো নীতি নির্ণয়ের প্রয়াস চুক্তিটিতে নেই।

তের নং ধারায় বেশ কৌতূহলোদ্দীপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি আগুন, দুর্ঘটনা, ধর্মঘট, দাঙ্গা, ঐশ্বরিক কারণ ও জন-সন্ত্রাসের ফলে প্রদর্শনী স্থগিত থাকে তবে তার জন্য ম্যানেজার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না। তা ছাড়া শিল্পী যদি এক মাসের বেশি অসুস্থ থাকেন ও অভিনয় করতে অক্ষম হন, তবে ম্যানেজার চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলতে অর্থাৎ বাতিল বলে ঘোষণা করতে অধিকারী থাকবেন।

অপর একটি ধারায় বলা হয়, প্রথম বৎসর আগন্তুক দল যদি আমেরিকায় সাফল্য লাভ করে, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হবে। সে ক্ষেত্রে শিল্পী ও তাঁর দলকে দ্বিতীয় বৎসরে ৪৩,০০০, তৃতীয় বৎসরে ৫০,০০০, চতুর্থ বৎসরে ৬০,০০০ ও পঞ্চম বৎসরে ৭০,০০০ ডলার সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হবে। যদি এই দলকে বেতার, গ্রামোফোন ও চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করতে হয় (এবং তা অবশ্যই ম্যানেজারের অনুমতি-নির্ভর), তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা যে পারিশ্রমিক পাবেন তার অর্ধেক ম্যানেজারের প্রাপ্য হবে।

শিল্পী ও ম্যানেজারের সম্মতিক্রমে আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য স্থানে

যে সমস্ত নাটকের প্রদর্শনী করার কথা স্থিরীকৃত হয়, সেগুলির নাম—সীতা, নাদির শাহ, শকুন্তলা, শাহজাহান, রমা ও পাষাণী। চুক্তিতে উল্লিখিত নাটকগুলি ছাড়া অপর কোনো নাটকের প্রদর্শনী সম্পূর্ণ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। উভয়পক্ষের যে কেউ যদি উপরোক্ত চুক্তিগুলি বা যে কোনো চুক্তি লঙ্ঘন করেন, তবে যে কোনো পক্ষের চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর অধিকার এককভাবে ম্যানেজারের।

কার্ল রীড ও শিশিরকুমারের স্বাক্ষরিত চুক্তির বয়ান সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উপস্থিত করা হল। মোটামুটি এই হল আমেরিকায় শিশিরকুমার ও তাঁর নাট্যগোষ্ঠীর আগমনের পটভূমি।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের শেষ পর্বে শিশিরকুমার সদলে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলেন। তার পরবর্তী ইতিহাস আমি সবিস্তারে বর্ণনা করতে আজও কুণ্ঠাবোধ করি। এই সফরে মার্কিন নাট্যরসিকদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে শিশিরকুমার ও তাঁর নাট্য-দল ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁরা ভারত থেকে যে পোশাক ও দৃশ্যপট এনেছিলেন, তা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। শিশিরকুমার, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রভাদেবী ও কঙ্কাদেবী ছাড়া অন্য কোনো যোগ্য শিল্পী দলে ছিলেন না। নৃত্যশিল্পীদের চেহারা ও অনুষ্ঠান ছিল খুবই অনুৎসাহব্যঞ্জক, যা প্রায় সবসময়ই দর্শকদের সরোষ বিদ্রূপের কারণ হতো। শেষে কিছু কালো চুল ও কালো চোখ-অলা স্পেনিয় নর্তকী ধরে এনে তাদের ভারতীয় বলে চালানোর চেষ্টা করা হতো। এই তথ্য যখন বাইরে জানাজানি হয়ে যায়, তখন আমাদের সকলকেই রীতিমতো অপমানজনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। দু-একজন বাদে দলের পুরুষ-সদস্যরাই সময়ে-অসময়ে এত বেশি মদ্যপান করতেন যে তাঁদের সংগঠিত ক'রে সুস্থ অবস্থায় মঞ্চে নামানো এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'সীতা' নাটকের ইংরিজি ভাষায় অভিনয়ের প্রচেষ্টাও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হল। সুনাম ও মানহানির আশঙ্কায় শিশির-গোষ্ঠীর আমেরিকায় আগমনের কিছুদিন পরই কার্ল রীড চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন

করতে অক্ষমতা জানান। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রদর্শনীগুলি একটির পর একটি বাতিল হয়ে যেতে থাকে। দল সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের মন্তব্য ছিল কঠোর ও নিন্দাসূচক। শ্রীমতী মারবারি প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে হাত গুটিয়ে নেন এবং এই দলটির আমেরিকা আগমনের প্রাক্-পর্বে তাঁর যে কোনো ভূমিকা ছিল, তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দল সম্পর্কে তাঁর কানে এত বিরূপ মন্তব্য এসে পৌঁছেছিল, যার ফলে তাঁদের একটি নাটকও তিনি দেখেন নি। সর্বোপরি, তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং প্রকারান্তরে আমাকে এক প্রাচ্যদেশীয় প্রবঞ্চক বলেই ঠাউরেছিলেন। তিনি এতদূর রুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে আমি যে সৌজন্য প্রবেশপত্রগুলি পাঠাতাম, সেগুলি তিনি অন্যদের বিলিয়ে দিতেন এবং অভিনয়ান্তে তাঁদের বিরূপ মন্তব্যের সারাংশ আমাকে পত্রদ্বারা জানিয়ে দিতেন।

শ্রীমতী মারবারি হাত ধুয়ে ফেললেন, কার্ল রীড চুক্তিপত্র ছিঁড়ে দায়িত্ব-মুক্ত হলেন, এরিক এলিয়ট উদাসীন হয়ে গেলেন। ফলে শিশিরকুমার ও তাঁর দলের অভিনয়ের ব্যবস্থা, ভরণ-পোষণ ও দেশে ফেরার প্রশ্নের সব ভার এসে আমার ওপর চাপল। আমার একটা নৈতিক দায়িত্বও এ-ব্যাপারে ছিল, কারণ আগাগোড়া এই সফর ফলপ্রসূ হওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘকাল আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি নিজের কাজে প্রায় ইস্তফা দিয়েছিলাম এবং পরবর্তী সময়ের সবটুকুই এই দলের জন্য ব্যয় করেছিলাম। আমার কয়েক বছরের অর্জিত অর্থের প্রতিটি কণা কেবল এই দলটিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছিল। সফরের শেষ দু'মাস একটি প্রদর্শনীও হয় নি এবং দলের প্রতিদিনের খরচ আমাকে বহন ক'রে যেতে হয়েছে। এই-ভাবে আমার মোট অর্জিত অর্থ ৩০,০০০ ডলার সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয়ে যায়। সুনাম বলতে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না এবং কাজের চরম গাফিলতি স্বরূপ ল্যাবরেটরি থিয়েটার আমাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আমার দুঃসময়ের বন্ধু ক্রিশ্চান হেগেনের সহায়তায় বহু কষ্টে দলটিকে জাহাজযোগে '৩১-এর প্রথম দিকে ভারতে পাঠাতে সক্ষম হই।

আমেরিকা থেকে ফিরে গিয়ে সেখানকার লাঞ্ছনাময় তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে যোগেশ চৌধুরী 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাঠকেরা সে-গ্রন্থ থেকে আমার কথিত অনেক তথ্যই স-বিস্তারে জানতে পারবেন। তবে যে কোনো কারণেই হোক, গ্রন্থটিতে তথ্যের বেশকিছু ভ্রান্তি আছে। যোগেশ চৌধুরী লিখেছিলেন, আমেরিকায় এসেই প্রথম তাঁরা আমার নাম জানতে পারেন। এ তথ্য যে কতখানি ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমি বিভিন্ন চিঠি ও দলিলের উদ্ধৃতি সহযোগে শিশিরকুমারের আমেরিকা আগমনের পশ্চাদ্ভূমিটির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

মানসিক এবং আর্থিকভাবে আমি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। শিশিরকুমার আমাকে আমেরিকা ত্যাগের প্রাক্কালে কথা দিয়েছিলেন যে দেশে ফিরেই তিনি আমার বিশাল ঋণের বোঝা পরিশোধ করবেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি সে-প্রতিশ্রুতি পালন তো করেন-ই নি, উপরন্তু আমাকে একটি চিঠিও দেন নি। প্রতিমুহূর্তে উত্তমর্ণরা আমাকে টাকার দাবিতে ঘেরাও করছিল এবং জুয়াচুরির অভিযোগে আমার কারাগার-গমনের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। দীর্ঘকাল শিশিরকুমারের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে একান্ত মরিয়া হয়ে আমি তাঁকে নিম্নোক্ত চিঠিটি লিখি :

May 13th, 1931

Dear Sisirda,

I have been anxiously waiting to hear from you. This is almost ten weeks, but there is not even a letter either from you or your brother. Please advise me what to do. I don't want to loose faith in you because my love for you and your work has always been very very sincere. I have been having the most awful time with all your creditors. Your grocer is going to fix up a fraud case against me. I have only another week to fix up with the most of them. I am sending you a telegram to day, hope I hear from you

immediately. Giving up the chances of work during the best part of the season I had as a matter of fact very hard time to make my both ends meet. Otherwise if it were another year, I Could have met all your obligations here. I don't want to write you all these but really brother I have been through a great deal of insult and harrasment since you left. Nothing more to write to day. My love to you, Kanka Devi and for every one else in the Company. I would also love to know what are your plan in the theatre over there.

Encl : I am also attaching a list of your obligations here.

Yours affectionately
brother and friend,
Satu Sen

শিশিরকুমার আমার এই চিঠিরও কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রায় একমাস বাদে তাঁর তরফ থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী আমাকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটির প্রতিলিপি নিচে তুলে দিচ্ছি :

50,2 Raja Rajballav Street,
5. 6. 31.

My dear Satu Babu,

I saw the letter you Wrote to Mr. Bhaduri and am very sorry for the terrible plight you are in for us. But I don't know exactly what to do. Days are awfully bad here. We are still amidst uncertainty and inaction. The Company is almost defunct. Monoranjan Babu got service elsewhere. Biswanath is going to Rangoon. He has got an apprenticeship there on insurance business. I still stick to Mr. Bhaduri, but don't know how long it's possible for me. This week we have a temporary performance for two

nights only. Some portion of the sale might be sent over to you unless the sale is too bad. After all, that won't save situation. I really don't know what Sisirbabu is after. Only this much I know, that we are all suffering, waiting for a chance. The situation is almost the same, as it was in New York, only we can get some private loans for each respectable family to carry on. I read with much pleasure and appreciation the article you wrote once. It was published in 'Advance'...

I should have written to you long ago. I am so grateful to you, but I can't find words that would be really welcome to you. My young friend, I am old enough to understand people and their sinceroty. I can only feel for you. Of course, Mr. Bhaduri is trying his level best to send the money, but he is already over head and ears with debt. Creditors are surrounding him day and night. And there is nothing to do, no work.

All I can do to help you, is to write out a play on Indian national movement and send a copy over to you, if you think you can do something out of it.

What do you think of coming back to India ? I learn your father is keen to get you back.

Yours affectionately,
Jogesh Chandra Choudhury

শিশিরকুমারের উপর আর ভরসা না ক'রে বহুকষ্টে দেনা মেটাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। এ ব্যাপারেও আমাকে ক্রিশ্চান হেগেন প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই দয়ায় অক্ষত অবস্থায় আমেরিকা ত্যাগ ক'রে ১৯৩২-এর ৬ জুন আমি এস. এস. ওয়েস্টারল্যাণ্ড জাহাজে নিউইয়র্ক থেকে ভারতে রওনা

হই। দেশে ফিরে আসার পর দীর্ঘকাল হেগেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষের তিনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন ও সেই শেষবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এতক্ষণ আপনাদের কাছে আমার প্রবাস জীবন ও সেখানকার নাট্য জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কিছু কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখন আমি সত্তরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য, চোখের জ্যোতি বর্ণহীন, স্মৃতি কখনও কখনও আমার সঙ্গে হয়তো বিশ্বাসঘাতকতাও ক'রে থাকবে। আমি যে সময়ে বিদেশে গিয়েছিলাম, সে সময় পাশ্চাত্যের নাট্য-আন্দোলনের এক বর্ণাঢ্য ও তরঙ্গময় কাল। তারই কিছু ফেনপুঞ্জ ইতিকাহিনীতে পরিবেশিত হয়েছে।

দেশে ফিরে আসার পর আমার মঞ্চ-জীবনের আর এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের শুরু। প্রাচীন অনেকেই সে উত্তর-কাহিনী অল্পবিস্তর অবগত আছেন। তরুণ বন্ধুরাও হয়তো সামান্য দু-চার কথা শুনে থাকবেন। একেবারে হালফিল আমলের অনেকেই হয়তো আমার নাম শোনেন নি। তাতে আমি দুঃখিত নই। কারণ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আমি আমার সাধ্যমত সামান্য অবদানটুকু রেখে যেতে চেয়েছিলাম, ব্যক্তি সতু সেনের নাম নয়। মৃত্যুর কালো ছায়া চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরছে। সময় নেই। তাই অতি সংক্ষেপে দু-চার কথায় এখানে ফিরে-আসার পরবর্তী অধ্যায় বিবৃত করার চেষ্টা করব। এ প্রয়াস একান্তই অসম্পূর্ণ হবে। কারণ, যা বক্তব্য আছে, তা আর একটি নাতিহ্রস্ব গ্রন্থের উপাদান হতে পারে।

কলকাতায় ফিরে এসে আমি যে নাটকটিতে প্রথম শিল্প-নির্দেশক হিসাবে কাজ করি, সে-নাটকটির নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। ১৯৩১-এর আগস্ট মাসে এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল রঙমহল থিয়েটারে। পরিচালক ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কঙ্কাবতী, প্রভা, সরযূ দেবী এবং পরিচালক স্বয়ং।

ঐ বছরই শেষের দিকে আমি নাট্যনিকেতনে পরিচালক ও শিল্প-নির্দেশক

রূপে যোগদান করি। সেখানে আমার প্রথম পরিচালিত নাটক শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত 'ঝড়ের রাতে'। অভিনয়াংশে মুখ্যত ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা ও পুতুল। নাটকটি বিভিন্ন কারণে দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ধরা-বাঁধা সময় ছিল না। অভিনয় হচ্ছে তো হচ্ছেই, দর্শকরা ইচ্ছেমত প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার আগে কোনো নাটক অভিনয় সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পরিস্থিতিবোধের অভাব আমাকে একান্তভাবে পীড়িত করে। তিন ঘণ্টার নির্দিষ্ট সময়-রেখার মধ্যে আমি 'ঝড়ের রাতে' নাটকটিকে বেঁধে দিই ও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দু'বার ক'রে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করি। ঘড়ি ধরে বাংলাদেশে নাটক আরম্ভ হওয়া ও শেষ হওয়ার উদ্ভব এই নাট্যাভিনয় থেকেই শুরু হল। নিউইয়র্কে মঞ্চের যেসব কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছিলাম, সেই অধীত বিদ্যার বেশ কিছু এই নাটকে প্রযুক্ত হল। দর্শকরাও সেই সর্বপ্রথম মঞ্চের উপর ঝড়-জল-বিদ্যুতের খেলা দেখেন। ইতিপূর্বে ফ্লাডলাইট ও স্পট ছাড়া আলোক-সম্পাত বলতে আর কিছুই ছিল না। নর্মান বেলগেড্ডেস-এর কাছে মনস্তত্ত্বসম্মত আলোক-প্রয়োগের যে ঔপপত্তিক ও ফলিত জ্ঞান লাভ করেছিলাম, 'ঝড়ের রাতে' নাটকে আমি সেই অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ করি। বাংলা নাটকে এইভাবেই মুড লাইটিং-এর প্রবর্তন হয়। তা ছাড়া এই নাটকটিতে প্রথম একটি দৃশ্যে সমগ্র নাটকটির অভিনয় করা হয়।

আমার পরবর্তী প্রযোজনা নজরুল ইসলাম রচিত গীতিনাট্য 'আলেয়া'। বিদেশী অপেরার আঙ্গিকে আমি এই গীতিনাট্যটির রূপদান করতে সচেষ্ট হই। রঙ্গমঞ্চে নজরুলের রচনার এই প্রথম পরিবেশন। প্রখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য এই অপেরাটিতেই প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। আলেয়ার ভূমিকায় ছিলেন নীহারবালা। নাট্যনিকেতনে আমার পরবর্তী প্রযোজনা: নিরুপমা দেবী প্রণীত 'দিদি'। নায়ক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

১৯৩৩ সালে আমি রঙমহল থিয়েটারে যোগ দিই। 'সিন্ধুগৌরব',

'পতিব্রতা', ইত্যাদি নাটক পরিচালনার পর আমি এক দুরূহ মঞ্চ-নিরীক্ষায় হাত দিই। সেটি হল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণ। স্থানু মঞ্চের উপর একটি দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন, বিভিন্ন চরিত্রের আগমন ও নিষ্ক্রমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হতো। দ্বিতীয়ত নাটকের গতি ও সচলতাও তাতে রীতিমতো বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার প্রয়াসেই আমি ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মাণে ব্রতী হই। রঙমহল ছাড়াও পরবর্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমাকে এ জাতীয় মঞ্চ নির্মাণ করতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে রাজপুতানার পিলানীতে বিড়লা এড়ুকেশন ট্রাস্টের প্রেক্ষাগৃহে আমাকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মাণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁদের আমন্ত্রণের উত্তরে আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম, তাতে তৎকালীন অর্থ-মান অনুযায়ী মঞ্চ-নির্মাণের খরচের যে হিসাব দেওয়া হয়েছিল, তা হয়তো সাম্প্রতিক কালের মঞ্চবিদ্‌দের কৌতূহলের খোরাক যোগাবে।

ESTIMATE OF A 30' DIA. REVOLVING STAGE

1.	Revolving portion of the stage complete with rims, spokes, ball-bearing, central pivot, worm and pinions etc. ..	L. S.	Rs. 4,600/-
2.	Driving motor (5 H. P.) with starter etc. ...	L. S.	Rs. 1,500/-
3.	Wood work ...	L. S.	Rs. 1,200/-
4.	Masonary Support..	L. S.	Rs. 2,500/-
5.	Fitting and erection	L. S.	Rs. 1,500/-
			Rs. 11,300/-

এ ছাড়া মঞ্চ-নির্মাতার পারিশ্রমিক হিসাবে ২,৫০০ টাকা দাবি করা হয়েছিল।

ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'মহানিশা'। এ জাতীয় মঞ্চে অভিনয়ে অনভ্যস্ত অভিনেতৃবর্গকে তালিম দিতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে

হয়েছিল। আজব মঞ্চ দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভেঙে পড়ত। রঙমহ
আমার অপর একটি প্রযোজনা 'সমাজ'। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রে
অভিনেতা ছবি বিশ্বাস এই নাটকে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। নাটকটির দু'
মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন শান্তি গুপ্তা ও রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর পর ঐ মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে অভিনীত হতে থাকে 'বাংলার মেয়ে
'নন্দরাণীর সংসার' (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাদেবী), 'মহামায়ার চ
(যোগেশচন্দ্র চৌধুরী), 'চরিত্রহীন' (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচা
শান্তি গুপ্তা), 'অশোক' (তিস্‌সরক্ষিতার ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা) ইত্যা
নাটক।

আমার পরবর্তী নাট্য-প্রযোজনা শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত একটি অভিন
ঐতিহাসিক নাটক, 'কামাল আতাতুর্ক'। নবীন তুরস্কের জন্মদাতা এ
মহান সংগ্রামী ও দেশপ্রমিকের কীর্তিগাথা আমাকে বরাবরই গভীরভা
আকৃষ্ট করত। আমি তাঁর বিচিত্র জীবন-কাহিনী নিয়ে শচীনবাবুকে এক
নাটক রচনার জন্য অনুরোধ করি। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা ক'রে আমা
বাধিত করেছিলেন। এই নাটক রচনা ও পরিচালনার জন্য নাট্যকার
আমাকে তুরস্ক-বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ পরিশ্রম-সহকারে পাঠ করতে হয়েছিল
নাটকটি রচিত হলে ইউনিক টকিজ লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী নন্দলাল দা
ও আমি তুরস্কের কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও 'কামাল আতাতু
নাটক এবং চলচ্চিত্রে প্রদর্শনের অনুমতি নিয়ে বোম্বাই যাই।

প্রচুর আয়োজনের মাধ্যমে নাটকটি নিউ এম্পায়ার-এ মঞ্চস্থ হয়
কামালের গৃহ, ইলদিস প্রাসাদ, সিরিয়া শহরের একাংশ, আন্নাসিমা-র এক
ভগ্নপ্রাসাদ, আঙ্কারার একটি গৃহ, কামালের যুদ্ধ-শিবির, সংসদ-কক্ষ ইত্যাদি
মঞ্চরূপ দিতে একাধারে যেমন প্রভূত ব্যয় হয়েছিল, অপরদিকে পরিশ্রম
করতে হয়েছিল অষ্ট-প্রহর। এই নাটকে নীতিশ মুখোপাধ্যায় ও সরযূ দেব
বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন।

১৯৩৯ সালে আমি নাট্যনিকেতনে পরিচালকরূপে প্রত্যাবর্তন করি
মঞ্চস্থ হয় শচীন সেনগুপ্ত-র প্রখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'। সিরাজে

ভূমিকায় অভিনয় ক'রে নির্মলেন্দু লাহিড়ী দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ‌ৃৎফা ও গোলাম হোসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে সরযূ দেবী ও ।বি রায়। পরবর্তী নাটক 'মীরকাশিম'-এ নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ।শস্বী নট ছবি বিশ্বাস।

অন্যান্য যে সব নাটক আমার পরিচালনা ও নির্দেশনায় নাট্যনিকেতনে ্রথম মঞ্চস্থ হয়, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল শরৎচন্দ্র ট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পথের দাবী'। স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে বৃটিশ নরকার কর্তৃক বে-আইনি ঘোষিত এই গ্রন্থটির আবেদন ছিল অসাধারণ। ্বাভাবিকভাবেই তাই নাটকের প্রদর্শনী দর্শকদের বিপুল আবেগ ও াহযোগিতা অর্জন করেছিল। থেন্-মণ্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছবি বিশ্বাস বপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা নেমেছিলেন, াঁদের মধ্যে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও শান্তি গুপ্তা।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে আমি নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে (অধুনা গ্রেস্ সনেমা) যোগদান করি। এখানে আমার পরিচালনায় 'চন্দ্রশেখর' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভানু ন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, সরযূ দেবী, অপর্ণা দেবী), 'দুই পুরুষ' (ছবি বশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সরযূ দেবী, অপর্ণা দেবী, ীলাবতী দেবী) 'দেবদাস', (নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ানোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত রায়, সরযূ দেবী, অপর্ণা দেবী), 'ধাত্রীপান্না' সরযূ, জহর, রবি) ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে আমি আবার আমার প্রিয় রঙ্গশালা রঙমহলে ফরে আসি। নতুন পর্যায়ে আমার প্রথম পরিচালিত নাটক এই 'স্বাধীনতা' —মুখ্য-ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী অবতীর্ণ হন। 'দেবদাস', 'রামের ‌ুমিতি', 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'দুই পুরুষ' এখানে পুনরভিনীত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র রচনা 'নষ্টনীড়'-এর নাট্যাভিনয়ে আমি শিল্প-নর্দেশনা দান করি। আমার পরিচালিত সর্বশেষ নাটক 'কর্ণ কুন্তী কৃষ্ণা', ১৯৫৮ সালে মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল।

সবসুদ্ধ সাতটি চলচ্চিত্র আমি পরিচালনা করি। চলচ্চিত্রগুলির না:
'মন্ত্রশক্তি', 'আবর্তন', 'পণ্ডিতমশাই', 'চোখের বালি', 'ইম্পসটার', 'সর্বজনী
বিবাহ-উৎসব', ও 'স্বামী-স্ত্রী'। 'মন্ত্রশক্তি'-র মুখ্য-ভূমিকায় ছিলেন জহ
গঙ্গোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তি গুপ্তা। 'পণ্ডিত মশাই' সে
বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র রূপে সর্বজনের অভিনন্দন পেয়েছিল। শরৎচন
স্বয়ং আমাকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছায় মণ্ডিত করেছিলেন।

আমার নির্মিত পরবর্তী চলচ্চিত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখিত 'ইম্পসটার'-এ প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পটভূমিতে একটি সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধর হয়েছিল। বাংলা চলচ্চিত্রে 'ইম্পসটার'-এই প্রথম এক ব্যক্তি একই সঙ্গে দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'-র চিত্ররূপ-দানের সময় আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য জোড়াসাঁকো বা শান্তিনিকেতনে যেতে হতো। একটি বিকেলের কথা বিশেষভাবে স্মৃতিতে আছে। শান্তি-নিকেতনে তাঁর অন্যতম বাসভবন 'শ্যামলী'তে বিকেল পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। আমকুঞ্জের কাছে একজন বাঁশিঅলার সুর শুনতে শুনতে আমি সে কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে যাই। হুঁশ হলে দেখি ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেছে। ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্র সমীপে গিয়ে পৌঁছই। তিনি মৃদু ভৎর্সনার সঙ্গে আমাকে কেবল একটি কথাই বলেছিলেন, 'বিদেশে এতদিন থেকে এলে অথচ বিদেশের নিয়মানুবর্তিতাটুকু সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে না!' 'চোখের বালি' আত্মপ্রকাশ করলে চলচ্চিত্রটি দর্শনান্তে কবি আমাকে ভূয়সী অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। আমার সেই পরমতম গৌরবচিহ্নটি দুর্ভাগ্যবশত হস্তান্তরিত হয়েছে। এই চিত্রে ছবি বিশ্বাস ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন।

'স্বামী-স্ত্রী' চলচ্চিত্রে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন চন্দ্রাবতী, ছায়া দেবী ও ছবি বিশ্বাস।

এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অলিখিত রয়ে গেল বহু ঘটনা, বিচিত্র

অভিজ্ঞতা ও অসংখ্য কাহিনীর সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দে মেশানো বিবরণী। ভারত-প্রত্যাগমনের পর থেকে সারাক্ষণ যিনি আমাকে সম্পদে বিপদে সমস্ত বিচলন থেকে বুক দিয়ে ধরে রেখেছেন, আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী সেন-এর সমর্পিত নেপথ্য-জীবনের কোনো কথাই এখানে বলা হল না। কেবল এইটুকু বলতে পারি, নিছক তাঁরই সেবা ও দাক্ষিণ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে আজও আমি অস্তিত্ব ধারণ ক'রে আছি।

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছুদিন নাট্য ও চিত্রলোকের সঙ্গে আমার প্রয়োগগত যোগ বিশেষ ছিল না। অপরের পরিচালিত বিভিন্ন নাটকে শিল্প-নির্দেশনা করেছি, এর বেশি কিছু নয়। পশ্চিমবাংলায় সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক-অকাদমি-র (অধুনা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা হলে আমি সেখানে নাটক-বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত জীবনেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নাটকের পরীক্ষকরূপে আমার যোগাযোগ রয়ে গেছে।

১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-অকাদমি-র সভাপতি শ্রীরাজমান্নার ও সহ-সভাপতি শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আমাকে মাদ্রাজে আহ্বান করেন। সেখানে সাক্ষাৎকারান্তে তাঁরা আমাকে দিল্লীতে সদ্য-নির্মিত ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের পরিচালক-পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করি। ১৩ জুলাই, আমার প্রথমা কন্যার বিবাহের রাত্রেই আমাকে কলকাতা থেকে রওনা দিতে হয়। ১৫ তারিখে আমি কর্মভার গ্রহণ করি।

এখানে থাকাকালীন দু'বার আমাকে অকাদমির নাট্য-পুরস্কার দানের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। নব-নির্মিত সংস্থা দুটির প্রথম পরিচালক-রূপে আমার উপর গুরুভার কর্তব্য অর্পিত হয়েছিল। আমার কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রধানত প্রশাসনের তত্ত্বাবধান, নিয়মিত ক্লাস নেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোক-সম্পাতের কলাকৌশল শিক্ষা দান করা। বিভিন্ন ধরনের রঙ্গমঞ্চের কয়েকটি অতিকায় মডেল আমি নির্মাণ করেছিলাম। হয়তো সংস্থার কোনো

কক্ষে সেগুলি আজও রক্ষিত আছে। ভারতের নানা অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের লোকাভিনয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে সচেষ্ট হতে হয়েছিল। বাংলাদেশের যাত্রার লুপ্তপ্রায় ধারাগুলির অনুসন্ধানে ঐ সময়ে বিশেষ তৎপর হয়েছিলাম।

অকাদমি-র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে আমি কলকাতায় ফিরে আসি। প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় কর্মজীবনে আমার এখান থেকেই বিচ্ছেদের সূত্রপাত হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাট্য-সম্মেলনে গুণীজন সম্বর্ধনায় দেশের নাট্যামোদীরা আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ক'রে আমার প্রতি যে অকুণ্ঠ প্রীতি ও ভালোবাসার পরিচয় দান করেছিলেন, তা আমাকে অভিভূত করেছিল। জানি না, সে ভালোবাসা প্রাপ্তির যোগ্যতা আমি সত্যিই অর্জন করতে পেরেছি কি না।

বর্তমানের নিরঙ্কুশ অবসরের মুহূর্তগুলিতে আমি অভিনয় এবং মঞ্চ-কলা ও আলোক-সম্পাত বিষয়ে দুটি পাণ্ডুলিপি রচনা সমাপ্ত করেছি। রচনা দুটিতে আমার দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে আহরিত অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা আমি মঞ্চ ও চলচ্চিত্র-রসিকদের সামনে কুণ্ঠার সঙ্গে নিবেদন করতে সচেষ্ট হয়েছি। এখন আমার মানসিক অবস্থা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'হেরিয়াছি সন্ধ্যালোকে, আমার সময় আর নাই।' তাই, জানি না, আমার মৃত্যুর পূর্বে এই পাণ্ডুলিপি দুটি মুদ্রণযন্ত্রের মুখ-দর্শন করবে কি না।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের নতুন জোয়ার এসেছে। এসেছেন বহু সম্ভাবনাময় পরিচালক, মঞ্চ-নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার এবং সর্বোপরি নতুনত্বের তৃষ্ণায় ব্যাকুল তরুণ দর্শক-সমাজ। আমার এই সংক্ষিপ্ত আত্মকথন যদি তাঁদের নাট্যমঞ্চের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ গভীরতর করে, তাহলেই এ প্রচেষ্টায় আশাতিরিক্ত সার্থকতা আমার উপর বর্ষিত হবে।

মঞ্চকারু

মঞ্চকার্ (স্টেজ-ক্র্যাফট) প্রসঙ্গে আসার আগে রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক স্তরোন্নয়ন বিষয়ে সংক্ষেপে বলে নিতে চাই।

প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের থিয়েটার অনেকটা ক্রীড়ামোদের মত ছিল যাতে জনতা অংশ নিত। যে বৃত্তটিকে ঘিরে অভিনয় জমত, সেখানে কুশীলবদের ঘিরে থাকত তারাই, অনুষ্ঠানে যাদের কিছুমাত্র করণীয় ছিল না।

প্রাচ্যে রঙ্গমঞ্চের মৌলিক প্রকৃতি ছিল ধর্মীয় উৎসবের মত। অংশ-গ্রহণকারীদের দর্শকদের মধ্য দিয়েই সাধারণত অভিনয়স্থানে ঢুকতে দেয়ার জন্য একটা দিক খোলা রাখাই ছিল রেওয়াজ। দর্শক ও কুশীলবের স্থান ছিল সমান সমান।

অভিনয় স্থানকে উঁচু করার ব্যাপারটা প্রথম ঘটিয়েছিল গ্রীসীয়রা। পূর্বোক্ত বৃত্তের একচতুর্থাংশ জুড়ে থাকত তাদের মঞ্চ। দর্শকরা বসে যেত পাহাড়ের গায়ে।

গ্রীকদের এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটাল রোমানরা। বৃত্তটিকে তারা ভাগ করলো দুই অংশে। কুশীলবদের ভাগ এবং দর্শকদের ভাগ। সর্ব-প্রথম রোমে চালু হল প্রসেনিআম। এ ছাড়া দৃশ্যপটও সকলের আগে রোমানরাই ব্যবহার করতে থাকে। অবশ্য গোড়াতেই তারা সেটা মঞ্চের ওপরে করে নি, করেছে প্রবেশ-প্রস্থান পথের অনতিদূরে সংকীর্ণ গাছের সারির

দৃশ্যের সাহায্যে। মধ্যযুগে অভিনয় হত মিরাকল্ নাটকের। এই মিরাকল্ নাটক মঞ্চস্থ হত দীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত মঞ্চের ওপর। সেখানে স্থায়ী দৃশ্যপটের ব্যবস্থা ছিল।

ইতিহাসের রেনেসাঁস পর্বে আমরা পেলাম রকমারি নয়ন-মনোরঞ্জক মুক্তাঙ্গন-উৎসব। এইসব উৎসবামোদে নামকরা শিল্পীরা প্রযোজনার জন্য দরকারি জিনিষপত্রের নক্সা এঁকে দিতেন। এ ধরনের কাজে এমন কি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মত মহাশিল্পীও আত্মনিয়োগে অভ্যস্থ ছিলেন। রাজকীয় উদ্যানে সচরাচর এই সব অনুষ্ঠান হত। এলিজাবেথের যুগেই প্রথম মঞ্চের উপরে ছাদ তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ভিতরটাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়াও সমকালীন ব্যবস্থা। এই সময়ে অ্যাপ্রনের উদ্ভব হলো। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল এবং একটি বক্স থেকে আরেকটি বক্স-এর মধ্যবর্তী অংশে অ্যাপ্রনের অবস্থান। ব্যবস্থাটি অনেক জায়গায় এখনও বর্তমান। স্থাপত্যানুগ ধরনে আঁকা পর্দা প্রবর্তিত হলো এই সময়ে। খাঁজকাটা স্লাইডের সাহায্যে এদিক থেকে ওদিকে টানাটানি করে এই ব্যবস্থাটি রূপায়িত হত।

বেষ্টিত মঞ্চ (Framed stage)

আধুনিক মঞ্চকেই বেষ্টিত মঞ্চ বলে। এই ব্যবস্থায় অ্যাপ্রন তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে অভিনেতার উপস্থিতি হয়েছে বাস্তবানুগ। একালের মঞ্চের প্রায় সব ব্যবস্থাই দুভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ দর্শকের জন্য, বাকি অংশটুকু শিল্পকর্মীদের স্বার্থে নিয়োজিত। দর্শকার্ধে থাকে প্রেক্ষাগৃহ, স্বাচ্ছন্দ্যময় বিচরণস্থান, বিশ্রামাগার, কয়্যার, অফিস প্রভৃতি। অন্যদিকে কুশীলবার্ধে থাকে মঞ্চ, সাজঘর, কনষ্ট্রাকশন শপ, গুদাম ঘর ইত্যাদি। মঞ্চের যে অংশটুকু দর্শকের চোখের সামনে খোলা থাকে, অর্থাৎ যেখানে নাটক অভিনীত হয়, সেটি অ্যাকশন এরিয়া বা অভিনয় স্থান।

ট্র্যাপস

*লিফট্, স্লাইডিং অথবা ব্রিজ ইত্যাদি অংশগুলি ট্র্যাপস-এর মধ্যে পড়ছে। হাইড্রলিক, বিদ্যুৎ অথবা কাউণ্টারওয়েট প্রক্রিয়ার দ্বারা এইগুলিকে সক্রিয় রাখতে হয়।

অ্যাপ্রন

অর্কেস্ট্রা-পিটটিকে ঢেকে বা না ঢেকে পর্দা বাড়িয়ে নিলে মঞ্চের মেঝের যে অবস্থানটি থাকে তারই অংশ বিশেষকে বলা হয় অ্যাপ্রন। প্রসেনিআমের কাজ হচ্ছে মঞ্চের নির্দিষ্ট এলাকাটিকে দর্শক-দৃষ্টির আড়ালে রাখা; নিবেদিত নাট্যকথার অনুভাবক হিসেবেও এর ব্যবহার চালু আছে।

মঞ্চকারু বা মঞ্চশিল্প বিষয়টা কি? ব্যাপক অর্থে কোন একটি নাটককে মঞ্চস্থ করার জন্য যাবতীয় কর্তব্যের সবটুকুই মঞ্চশিল্পগত। অন্যান্য আরও অনেকের মতই ডিজাইনার, ছুতোর, বিদ্যুৎ-বিদ প্রভৃতি সকলেই এই মঞ্চশিল্পের এক্তিয়ার-ভুক্ত। বাস্তবিক, একটা নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতার জন্য অনেকখানি দায়ী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শ-ই এই সব শিল্প অবহেলা বা অপ্রকাশের আঁধারে চাপা পড়ে থাকে। বহু সময়ে এ সবের অভাবে যথা-কালে পুঙ্খানুপুঙ্খ আবশ্যকীয়ের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে, সু-অভিনয় ব্যাহত হয়। থিয়েটার এমন একটা আর্ট যা বিভিন্ন শিল্পের যোগফল। এমনকি দৃশ্যাবলীর যথোপযুক্ত ব্যবহারও একটা শিল্প, যার দ্বারা প্রেক্ষাগৃহ অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে থাকে।

অসময়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারে একটা দৃশ্যকে বানচাল করে দেওয়া যায় খুব সহজেই। ধরুন, একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকে অভিনেতা সুইচ্ টিপলেন কিন্তু অভীষ্ট জুটল না, আলো জ্বলল না। অথচ খানিক বাদে সেই অভিনেতা অন্যদিকে হেটে যেতেই হঠাৎ রহস্য-জনক ভোজবাজির মত কোথা থেকে জ্বলে উঠলো আলো। বহু সময় এমনও হয়েছে যে অভিনেয় নাটকটির

বিষয়ে প্রম্প্টার বিন্দ্বিসর্গ না জানায় প্রয়োজনীয় বিরতির মুহূর্তেও গড়গড় করে সংলাপ বলে যাচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মঞ্চকার একঘেয়েমিতে পূর্ণ। কিন্তু সাগ্রহে এবং আন্তরিক ভাবে বিষয়টিকে নিলে এটি আর একঘেয়ে থাকে না। কাজটি আগ্রহোদ্দীপক, নতুন নতুন ভাবনার উদয়ে এবং নবনব আবিষ্কারের ফলে ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। এর ফলে এই শিল্প-কর্মটি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। মঞ্চকার নামধারী এই শিল্প-বিজ্ঞানটির সমস্ত বিভাগে একমাত্র সূক্ষ্ম নির্দেশনার মাধ্যমেই যথাযোগ্য আকর্ষণ বজায় রেখে একে সমগ্র প্রযোজনার সাথে সমতাল করা সম্ভব।

প্রযোজকের পরেই থাকছেন স্টেজ-ম্যানেজার, যাঁর গুরুত্ব সর্বদা স্মরনীয়। তাঁর দায়দায়িত্ব নানা রকমের। যে কোন আদর্শ ম্যানেজার সর্বদা যথাসত্বর এবং ন্যূনতম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ সেরে দেবেন। এর পরে আসেন বিদ্যুৎ-বিদ্। মঞ্চের ওপরকার যাবতীয় আলোকসজ্জার আয়োজন এবং নিয়ন্ত্রন করা তাঁর কাজ। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার তাঁকে শিখতে হবে। বৈদ্যুতিক কলাকৌশলের মাধ্যমে যেসব মঞ্চগত পরিবেশ সৃজন সম্ভবপর, তাও জানতে হবে তাঁকে। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে নতুন রঙ সৃষ্টি করার কৌশলও তাঁকে ভালভাবে জানতে হবে। যে কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে বর্ণালী আলোকের এবং রঙিন পোশাক-আশাকের ওপর যাবতীয় আলোক-প্রয়োগ তাঁর আয়ত্ত হওয়া আবশ্যকীয়। বিদ্যুৎ-বিদকে যেহেতু আলো নিয়ে কাজ করতে হয় আর বলা বাহুল্য যথাস্থানে দরকার মাফিক অদলবদল ঘটাবার অধিকারীও তিনি সেই হেতু তাঁকে বিশেষভাবে নিয়মমাফিক হতে হয়। বিদ্যুৎ-বিদের গুণাবলী সম্পর্কে এটা একটা মামুলি নক্সা দেয়া হল মাত্র। যে কথা আগেও বলেছি, তাই আবার বলতে হয় যে, মঞ্চালোক-ব্যবস্থাটি বিজ্ঞান ও শিল্প দুই-ই।

পোশাক-সংরক্ষণকারীর দায়িত্ব নিয়মানুগত্য ও বিবেচনা এই উভয়ের অধীন। প্রথমত তাঁর কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাতে যথা-সময়ে এসে পৌঁছয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সমস্ত জওয়াজিমা যেন

ঠিক সময়ে মঞ্চে হাজির হয় এটাও খেয়াল করা।

কোন সময়ে কোন পোশাকটির ডাক পড়বে এই বিষয়ে পোশাক-সংরক্ষণকারীর সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। আবশ্যকীয় অথচ সামান্য জোড়াতালি রিপু ইত্যাদি কাজও তাঁকে অল্পবিস্তর জানতে হবে।

সহকারী কর্মীদের চাহিদা মত দৃশ্যাবলী আর আসবাবপত্রগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এ রকম একটা নেহাত ভুল ধারনা প্রচলিত যে, দৃশ্যাবলী স্থানান্তরণে নৈপুন্যের কোন ভূমিকা নেই। আদপে এর উল্টোটাই হচ্ছে সত্যি কথা। এই কাজ অবশ্যই তেমন সব ক্রিয়ার অন্তর্গত যা কোন লোককে দক্ষ হয়েই করতে হয়। সহকারী কর্মীদের অন্যান্য অনেক কাজও হামেশাই করতে হয়। কেউ হয়ত পর্দা টানবেন। আবার কাউকে বা নিযুক্ত থাকতে হবে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য। গোলযোগ বোঝাবার জন্য আওয়াজ ইত্যাদি করা এর মধ্যে পড়ে। এর পরেই আসছে চিত্রাংকনের কথা এবং ক্রমে অন্যান্য বিষয়।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে বস্তুত যে কোন একটা নাটককে মঞ্চস্থ করবার জন্য আবশ্যকীয় সর্ববিধ পালনীয় শিল্পকর্মই মঞ্চশিল্পের মধ্যে পড়ে। আমার আমেরিকায় অবস্থানকালে আচার্য স্তানিস্লাভস্কির শিষ্য রিচার্ড বলিশ্লাভস্কির সহযোগী হিসেবে অনেক মহার্ঘ ক্লাসিক প্রযোজনার সাথে সংশ্লিষ্ট হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি দেখেছি, মঞ্চশিল্পের চৌহদ্দিগত এই সব বিভিন্ন শিল্প পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত হত এমন সব ব্যক্তির দ্বারা, নিজের নিজের বিষয়ে যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অতিদক্ষ। অন্যদিকে আমাদের শতাব্দী-প্রাচীন মঞ্চ-ব্যবস্থার ঐতিহ্যে আমরা কি দেখতে অভ্যস্ত? সর্বদাই সম্পূর্ণ ঝুঁকি সেই একটি মাত্র মানুষকেই নিতে হচ্ছে, মঞ্চশিল্পী নামে যাঁর পরিচিতি, সাধারণত তিনিই সামগ্রিক অর্থে মঞ্চশিল্প বলতে যা বুঝি, তার শীর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁকেই দৃশ্যপটগুলো কি রকমের অর্থাৎ কি জাতের সে বিষয়ে ভাবতে হবে এবং প্রত্যেকটিকে যথাযোগ্য সাজিয়ে গুছিয়ে সৃষ্টি করতে হবে তাঁকেই। দৃশ্যাবলী বা অন্যান্য যা কিছুই আঁকা হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্কনসহ সম্ভাব্য পরিকল্পনা পেশ করতে হবে। এবং প্রত্যেকটি

অঙ্কন ও পরিকল্পনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে। এই ধরনের খুঁটিনাটি কাজে শিল্পী নিতান্ত মনোযোগ দিয়ে থাকেন জিনিসগুলো তৈরী করার ও আঁকার সুবিধার্থে, বলাই বাহুল্য।

সেই পরিকল্পনার অভিপ্রেত রূপায়ণ বাস্তবিকই হচ্ছে কিনা সেদিকেও চোখ খুলে রাখতে হয় তাঁকে। নন্দনতত্ত্ব-সম্মত যথার্থ নাটকীয়তা সেই সব পরিকল্পনার মাধ্যমে কতটা এবং কি পরিমাণে পাওয়া যাবে তার পরিপূর্ণ দায়িত্ব মঞ্চশিল্পীর 'পরেই বর্তায়। মঞ্চশিল্পীকে অবশ্যই শিরস্ত্রাণ, পরচুলা, জুতো প্রভৃতি জিনিস এবং অন্যবিধ আনুসঙ্গিকেরও নকসা করতে হবে। ঐ সব জিনিষ প্রস্তুতির জন্য লাগবে, এমন সব আঁক-জোকও তাঁকে মানানসই ভাব, মাপ ও স্বাচ্ছন্দ প্রভৃতির দিকে নজর রেখে করে দিতে হয়। জিনিসগুলো যেন টেকসই হয় এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে মঞ্চশিল্পীকে। সেটে উপস্থিত লোকদের আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক-সম্পাতের ডিজাইনও তাঁকে ধাবনা করায় সমর্থ হতে হবে। যা কিছু তুলে ধরা এবং চাপা দেয়া—দুয়ের জন্য আবশ্যকমত সব কিছুরই প্রায় মোটা রকমের উপায় ভেবে বের করতে হবে তাঁকেই। মহড়ার সময়ে মঞ্চশিল্পীকে নজর রাখতে হবে সেটিংস, পোশাক এবং আলোকসজ্জার ন্যায্য স্থানিক ব্যবস্থার প্রতি।

কিন্তু দৃশ্যপটগুলো তৈরি হবে কি উপায়ে? সুন্দর একটা ছবি বাঁধাই করতে যেমন চাই সেরা জাতের ফ্রেম, ঠিক তেমনই সু-অভিনয়ের জন্য লাগে ভালো সেটিংস। ঠিক এইজন্যই গোড়া থেকেই কোন প্রযোজনার জন্য দরকারি ডিজাইনগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হবে, কোন যোগ্য পরিচালক স্বয়ং বাতিল করেন এমন সেটিংস নিয়ে কদাচিৎ কাজ করবেন না। এটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং সে কারণেই কাম্যও বটে যে পরিচালক তাঁর দরকারি ও কাঙ্খিত সেট, পোশাকআশাক ও রঙের পরিকল্পনার বিষয়ে মনে মনে একটা পরিষ্কার ধারনা পোষণ করবেন এবং প্রযোজনার হাত দেয়ার সময় থেকেই তাঁকে এবিষয়ে তৈরি থাকতে হবে।

মহড়া আরম্ভ হবার আগের থেকেই দৃশ্যপট, সাধারণ বর্ণ ও আলোক প্রক্ষেপণ-পরিকল্পনা কি ধরনের হবে এ বিষয়ে পরিচালককে প্রাথমিক

নকশা করে ফেলতেই হবে। কারণ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আশু প্রয়োজনীয়ের অন্তর্গত। নকশার যথার্থ সৌন্দর্য বিষয়েও পরিচালকের পরিচ্ছন্ন বোধ থাকা দরকার। মানসিক কোন ভাব-ভাবনার, যা কিনা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে, তার প্রারম্ভিক পর্যায়কে আমরা বলব নকশা।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা-সম্পন্ন বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটা অর্গানিজম এই মঞ্চশিল্প। অংশের সম্পর্ক যেমন পূর্ণের সঙ্গে, পূর্ণেরও অংশের সঙ্গে। নকশা, বাড়ী তৈরি, সঙ্গীত, কবিতা এবং অঙ্কন—এগুলোর সব কিছুর সৃষ্টিতেই ক্রিয়াশীল মৌল নীতিটি এক। এর মধ্যে ভিস্যুয়াল ফর্ম হবে এমন একটা রঞ্জিত আকৃতি (coloured shape) যা আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকে জ্বালিয়ে দেবে নন্দনের স্বাদ গ্রহণের দিকে। দৃশ্য, নকশা, আকৃতি এবং রঙকে একটা অবয়বের মধ্যে বেঁধে ফেলা হবে। একটা নকশায় প্রত্যেকটি আকার এবং প্রতিটি বর্ণের রকমফের সেই মূলগত চাহিদা থেকে জন্ম নেবে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি হবে নকশাটির চূড়ান্ত পরিণামের পক্ষে আবশ্যকীয়। পরিষ্কার ভাবে বক্তব্য-ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার যোগ্যতাতেই শিল্প-কৌশলটির মূল্য নির্ভরশীল। আমরা নকশা কথাটার ভ্রান্ত প্রয়োগ সাধারণত দেখে থাকি। লোকে ভুলে যায় যে অলঙ্করণের সঙ্গে এর কোন সারূপ্য নেই, বরং দুটোর যোগশূন্যতাই অনেক বড় ঘটনা। অলঙ্কার আসলে হচ্ছে মসৃণ সমতল-বিশিষ্ট একটা প্রয়োগ কৌশল। অন্যদিকে নকশা হল তারই অবয়ব যাতে কিনা অলঙ্কারের প্রয়োগ হবে। অলঙ্কারের ভিতরে একশবার নকশার আদল থাকা সম্ভব, কোন একটা নকশারও তেমনি অলঙ্করণ সম্ভব, অথচ, দুটো সম্পূর্ণ-ই স্বতন্ত্র। অভিনেতার কণ্ঠস্বর বা ভাবভঙ্গি যেমন দর্শকের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে, নাট্য-বিষয়ে ঠিক সেইরূপই সুপ্রস্তুত নকশা তার চোখের সম্মুখে ভাঁজে ভাঁজে খুলে ধরে নাটকটিকে। একজন নকশাবিদের ভাব-প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে সেটিংস্, পোশাক, আলোক-সম্পাত এবং ঐ সবের মিলিত রূপায়ণ। একক সত্তায় এরা ভারী দুর্বল এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টার্থে পরস্পরের সহযোগী হিসেবেই এদের সক্রিয় থাকা উচিত।

কোন একটা স্টেজ সেটিং-এর নকশা করার সময় সবার আগে যে কথাটা স্মর্তব্য, তা হল মৌল কর্তব্যের কথা। নাট্যকারের উদ্দিষ্ট ভাবটি অভিনেতা ও পরিচালক যাতে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন সেই ভাবে কাজ করাই নকশাবিদের কর্তব্য। সেটিং হচ্ছে সেই বিষয়, যার পটভূমিতে নাটকের অগ্রগমন সিদ্ধ হয়, এবং নাট্যবস্তুর গুরুত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে উক্ত পটভূমির গুরুত্বও পরিবর্তিত চেহারা নেয়। তাই নকশাবিদকে কখনও ভুললে চলবে না যে শেষ পর্যন্ত নকশা পটভূমি ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এমন নকশাবিদ আছেন যাঁরা আপনার কাজটিকে সুমহৎ অনুভবের দ্বারা সাধন করে থাকেন। বোধ করি তাঁরা ভাবেন যে সামগ্রিক প্রয়োজনে সেটিংস্ একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কিছু; সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ কর্তব্য হবে তাঁর ধারনাকে আশাতীত গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা। কারণ তাতে ক'রে দর্শকেরা দৃশ্যাবলীর প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি দেবেন এবং নাট্য-ক্রিয়ার প্রতি নজর প্রায় থাকবে না। দৃশ্যাবলী তখন আর অভিনয়ের সহায়ক না হয়ে আপত্তিজনক একটা বিঘ্ন হয়ে দেখা দেবে। যার ফলে পুরো ব্যাপারটি মাঠেই মারা যাবে। সে কারণে সূচনাতেই নকশাবিদের এই ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া চাই যে তাঁর কাজ খুব প্রয়োজনীয় হলেও আদৌ চূড়ান্ত নয়। এবং অতিরিক্ত চোখে পড়া কোন রকম দৃশ্যাবলীর দ্বারা আসলে একটা নাট্য প্রযোজনাকেই সমূলে পণ্ড করা হয়।

ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আর এই ভুলটা সযত্নে এড়াবার জন্য তিনি অতি অবশ্যই নাট্যাবেদনের মর্মরসটি পূর্ণতঃ অনুভব করবেন। বহুবার তাঁকে নাটকটি পড়তে হবে, যাতে করে তিনি সেটির সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেন। সর্বোপরি নাটকটি নিয়ে তাঁকে পরিচালকের সঙ্গে আলাদা বসতে হবে। লেখকের সৃজনশীল অভিপ্রায় প্রায়ই এরূপ স্বচ্ছ হয় না যাতে কিনা দুজন লোক তাদের একই ভাবে ব্যাখ্যা করে। সেইজন্যই বিশেষত পরিচালক এবং নকশাবিদের মধ্যে আলোচনা হওয়া চাই। এর দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতে তথা শিখতে পারবেন কোন পথে নাট্য-প্রযোজনা এগোবে এবং কোন কোন মৌলিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বহু

সময়ই নকশাবিদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচালকের চিন্তার সংঘাত বাঁধাতে পারে। বলা বাহুল্য, ঘটনা যখনই এরকম গতি নেবে, তখন পরিচালকই চূড়ান্ত হবেন, কারণ, শেষ কথা বলার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই। যে কোন একটা প্রযোজনার ক্ষেত্রেই নকশাকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে। সেটিংস্, হ্যাঙ্গিং, আসবাবপত্র এবং পোশাকআশাক ইত্যাদি সব কিছুকেই একমেব প্যাটার্নে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই নকশার সাফল্য সাধারণ বোধ ও সুরুচির ওপর বড় রকমে নির্ভরশীল।

একজন মোটামুটি দক্ষ নকশাবিদ যদি বিষয়ানুগ চিন্তা করেন ও যথাসাধ্য সচেষ্ট হন তাহলে তিনি যেমন দরকার তেমন পোশাক আর আসবাবপত্রের সাহায্যে অনেকগুলো বিকল্প দৃশ্যপট সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু কোন নকশাকারের উচিত নয় বাস্তব উপযোগিতাবিহীন সুন্দর সুন্দর দৃশ্যপটের পেছনে শক্তিমত্তার খেলা প্রয়োগ করা। দৃশ্যাদি ও পোশাকের নকশা করা বাদেও নাটকে প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয়ের সম্পর্কে যথাযোগ্য পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকা কাম্য।

এর থেকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এটুকু বোঝা গেল যে প্রযোজনার সম্পূর্ণ স্বার্থে আকাঙ্ক্ষিত যাবতীয় কাজের সঙ্গেই নকশাবিদের পরিচয় বেশ খোলামেলি গোছের হবে। যে রঙ্গমঞ্চে তাঁকে কাজ করতে হবে, সেখানে কি করা প্রয়োজন আর তা কতদূর করা সম্ভব সে বিষয়ে তাকে সচেতন হতে হয়। যে দৃশ্যপট নাটকের আগাগোড়া প্রযুক্ত হবে আর সেই সব দৃশ্য যেগুলো কোনো কোনো অথবা বিশেষ একটি মাত্র দৃশ্যে প্রযোজ্য—দৃশ্যের এই দ্বৈধ প্রকৃতি নকশাবিদকে বিভিন্ন বা দ্বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি করে।

প্রথমটি অত্যন্ত সরল ব্যাপার। যদি কোন একটা দৃশ্য কোন নাট্যক্রীড়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তখন শিল্পী তাঁর মনের সাধ মিটিয়ে প্রচুর ব্যয়বহুল কারুকার্যখচিত দৃশ্যপট নির্মাণ করতে পারেন। কোনো একটি দৃশ্যপটকে স্থাপন বা অপসারণ করবার পূর্বে সব কিছু খুঁটিয়ে ভাবা দরকার। কারণ সেই দৃশ্যটি রাখা বা না রাখা দুই-ই দর্শকের মনে

গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রতিক্রিয়া ভালোমন্দ দুইদিকেই। দৃশ্যের পালাবদল করা এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে দৃশ্যের পূর্ণ দৃশ্যমানতা সম্পর্কে নকশাবিদের গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ স্মরণ থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়েই এটা পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু যতখানি পারা যায়, তার চেষ্টা তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে।

✓সাধারণভাবে বলতে গেলে নকশাবিদরা দু জাতের—অবস্তুবাদী বা ভাববাদী এবং বাস্তববাদী। বস্তুবাদীরা দৃশ্যবিশেষের স্থানের পরিচয় দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতেই সচেষ্ট। ভাববাদীর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পদ্ধতি (Broad effect) গ্রহণ করে ভাববাদী শিল্পী অঙ্কিত দৃশ্যের একটা ভাবগ্রাহ্য অনুভূতিই দর্শকদের মনে দেগে দিতে চান। মৌলিক ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীদের অনেকেই এ জাতের। অধিকাংশ সময়ই ভাবময় ধাঁচে নকশা গড়তে এঁরা প্রলুব্ধ হন। অনেক সময় তাঁরা ভুলে যান যে, নাটকের মৌলিক আবেদনের সঙ্গে তাল রেখে আদপের নকশাগুলো পরিকল্পিত হচ্ছে কিনা। অন্যথায় নাটকের মূলসূত্রের সঙ্গে নকশার অনাত্মীয়তা অনিবার্য।

বাস্তবসম্মত নকশা তৈরির ক্ষেত্রে কল্পনার অতিরিক্ত বিস্তারের সুযোগ নেই, এই ধরনের চিন্তা প্রচলিত। সহজ এবং সাধারণভাবে কেবল অভ্যন্তরভাগের নকশা করাটাও মূলত শিল্পকর্ম। মঞ্চশিল্প আলোকচিত্রের মত নিখুঁত হতে পারে না এবং হওয়া অভিপ্রেতও নয়, একথাটা শিল্পীকে কখনই ভুললে চলবে না। মঞ্চকারের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায় সব কিছুকেই বাড়িয়ে বলার ভেতর। যে কোন একটা দৃশ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সাধারণ ঘর অপেক্ষা আয়তনে সেটি বেশ বড়। মঞ্চে সাধারণ সংলাপ আবৃত্তির সময়েও অভিনেতাকে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে আরও সতেজ ও সোচ্চার করে প্রকাশ করতে হয়। অঙ্গভঙ্গিমাও তাঁর অতিকৃত হবে। তাঁকে তাঁর মুখাবয়ব রাঙিয়ে নিতে হবে অস্বাভাবিক রকমের কড়া ও উজ্জ্বল আলোকসম্পাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেহের তন্ত্রিগুলিকে সচল রাখবার মানসে। দৃশ্যের মাপকাঠিতে বা বিচারে এই অতিকরণ প্রযোজনায় অনেক সময় কিছু

দূরত্ব বজায় রেখে দেখলে পশ্চাৎপটের ছোটখাটো বিষয়গুলোকে ঠিক আছে বলে মনে হবে অথচ দর্শকের আসন থেকে দেখলে সেটাকেই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। সে কারণেই কাম্য সমমাত্রিতা জাগাতে হলে দৃশ্যপটকে খানিক মোটা দাগে স্পষ্ট করে নেয়া চাই।

বস্তুবাদী নকশার অভ্যন্তরভাগটি এমন করে আঁকা হবে যাতে দর্শকের চোখে পড়ামাত্র তার ভেতর দিয়ে গৃহস্বামীর সামাজিক অবস্থার হুবহু ছবি ফুটে ওঠে এবং সেই সঙ্গে দর্শক যেন অনুভব করতে পারে আগামী দৃশ্যের সম্ভাব্য মেজাজ (mood) টিকেও। এক-কথায়, আলোচ্য দৃশ্যটি একমাত্র না হলেও এ রকম একটা দৃশ্য অভিনীত হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী ছিল এই বাসনাটাও দর্শকমনে জাগিয়ে দিতে হবে। কৃত দৃশ্যসজ্জার দ্বারা ঠিক সেই ভাবটিই ফুটিয়ে তোলা দৃশ্যশিল্পীর অভীষ্ট, যেটি যবনিকা ওঠা মাত্র দর্শকের মুখ দিয়ে 'সাধু' কথাটি বলিয়ে নেয়। ম্যাকস্ রাইনহার্ডের দৃশ্য-নির্মিতির পদ্ধতি এরকমই ছিল এবং যে কোনো কল্পনাশীল শিল্পীই এই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। বিশেষত দৃশ্য-বহুল নাটকে এই পদ্ধতির সাফল্য আশাতীত। প্রসঙ্গত সবচেয়ে দরকারী কথাটি এই—সার্থক দৃশ্যশিল্প ও নাটকের মূল আত্মার হরগৌরী মিলন হলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

অবশ্য বহির্দৃশ্য অঙ্কনের সময় শিল্পীর সুযোগ অপর্যাপ্ত। সে সময় তাঁকে সীমিত বন্ধনে আকৃষ্ট থাকতে হয় না। কোনো একটি বহির্দৃশ্যের পরিকল্পনা করার সময় চলচ্চিত্র-কুশলীর ওপরে নকশাবিদের এই এক বিশেষ সুবিধা বর্তমান যে, তিনি তাঁর ভাবনা রূপায়নের জন্য দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র হাতের কাছেই পাচ্ছেন।

ভাববাদী উপায়ে বহির্দৃশ্যের নকশা করা এবং তার প্রয়োগ করা বস্তুবাদী প্রয়োগ অপেক্ষা সরল। সহজভাবে শিল্পিত বহির্দৃশ্য অঙ্কনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে দৃশ্যটির নিখুঁত আন্দাজ করা। সুপরিকল্পিত দৃশ্যপটকেও অসম আলোকসম্পাত ব্যর্থ করে দিতে পারে। বর্তমানে মঞ্চের ওপরের সজ্জা উঁচুদরের শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। ফলতঃ এ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন বোধ-

সম্পন্ন একজন শিল্পী অত্যন্ত সরল ও সহজ ভাবে আঁকা দৃশ্যপট নিয়েও বিস্ময়জনক ফল লাভ করেন। দৃশ্য ও পোশাকের সম্ভাব্য রং সম্পর্কেও নকশা করার সময় সর্বদা চিন্তা করতে হবে দর্শকচিত্তে প্রযুক্ত বর্ণের প্রভাব। কারণ আসল কথাটি হচ্ছে এই যে সজ্জিত আলোকসম্পাতের দ্বারা দৃশ্য ও পোশাক-সম্পর্কিত ধারনাটাই সম্পূর্ণ পালটে দেওয়া যায়।

আমাদের দেশীয় মঞ্চগুলিতে আর্থিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে দৃশ্যসজ্জা অপ্রতুল বলে বোধ হয়। এক্ষেত্রে একজন সৎ পরিচালকের মনে হতে পারে স্থায়ী দৃশ্যপটের ব্যবস্থা করা হয় না কেন, হলে কেমন হয় ইত্যাদি। দিশি যাত্রা বা অন্যান্য নাট্যানুষ্ঠানে প্রচলিত ঐতিহ্যানুগ দৃশ্যপটের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে স্থায়ী দৃশ্য পরিকল্পনা করা উচিত, এ কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কিন্তু এই স্থায়ীদৃশ্য পরিকল্পনার প্রকৃত আদর্শ কি হওয়া উচিত?

এ ক্ষেত্রে কেবল গ্রীকমঞ্চের আদর্শকেই আরও উন্নত ও আধুনিক করে গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রীকমঞ্চে অভিনেতাদের জন্য একটি মাত্র স্তর নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অভিপ্রেত মঞ্চে বিভিন্ন স্তরের সন্নিবেশ চাই যাতে নানা অংশে বিভক্ত মঞ্চটি অভিনেতৃকুলের স্বাভাবিক গতিবিধির পক্ষে একান্ত সহায়ক হবে এবং এর থেকে নানাবিধ সুবিধা নিংড়ে নেয়া যাবে। নাটকের আন্তরিক গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়ার দরুণ আদ্যোপান্ত ঘটনাটাই আবেদনশীল হয়ে দাঁড়াবে। এজাতীয় মঞ্চ নির্মাণ বাস্তবিকই সম্ভবপর এবং আমাদের মত হৃতসর্বস্ব দেশে এটাই আপাততঃ একমাত্র সদুপায়।

বলাবাহুল্য, স্থায়ী মঞ্চে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত এবং সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থিত আলোকসম্পাত আর অভিনেতৃসম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা গড়ে ওঠা মেজাজের প্রতি মূল ঝোঁক দেয়া চাই। বিখ্যাত মঞ্চবিদ জ্যাক কোপো এই ধরনের মঞ্চের পরীক্ষা-নীরিক্ষায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। এই জাতীয় মঞ্চেই মস্কো আর্ট থিয়েটার এ্যারিস্টফেনেসের 'লিসিসস্ট্রেটাস'-এর এক অতি মনোজ্ঞ ও রসোত্তীর্ণ নাট্যরূপায়ন দান করে। এদের উপস্থাপিত 'কার্মানসিটা এ্যাণ্ড দি সোলজার' এই শ্রেণীর আর একটি গৌরবময় উপস্থাপন। মেয়ারহোল্ডের সমস্ত প্রযোজনাই হাজির করা হয়েছে স্থায়ী

দৃশ্যপটে। চলাফেরা, নাট্যগতির বিভাবনা ও আলোকসম্পাতের ওপরে সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এই সব দৃশ্যপটের পরিকল্পনায় ও ব্যবহারে। মস্কো থাকাকালীন এই জাতীয় বেশ কিছু প্রযোজনা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই রকম স্থায়ী দৃশ্যাদিবিশিষ্ট মঞ্চনীতি গ্রাহ্য হবার ওপরেই যে ভারতীয় নাট্যশিল্পের এবং নাট্যসাহিত্যের প্রগতি নির্ভর করছে, এ বক্তব্যে উত্তরোত্তর আরও আস্থাশীল হয়ে উঠছি। অবশ্য পশ্চাৎপটে সুসম যবনিকা প্রয়োগ করার ভেতরেও এর যথেষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত এবং মুখ্যতঃ অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে খরচ এখানে যৎকিঞ্চিৎ। দ্বিতীয়ত, দৃশ্য অদলবদলের ঝামেলাও এখানে প্রায় অনুপস্থিত। এবং তৃতীয়ত বা সর্বোপরি পর্দা সমন্বিত দৃশ্যপটের ব্যবহারের রেওয়াজ যেহেতু সর্বব্যাপী, সেক্ষেত্রে একটা কুদৃশ্যকে বাতিল করে সুব্যবস্থিত যুৎসই ধরনের যবনিকার ব্যবহার অনেক সময়েই যথেষ্ট গভীর অর্থ ও সুসঙ্গতি নিয়ে আসে। ক্যানভাসের ওপর আঁকা দৃশ্যাবলী থেকে এগুলো অনেক বেশী উপযুক্ত। একটি শিল্পসম্মত উপায়ে অঙ্কিত সুলম্বিত যবনিকা দৃশ্য হিসেবেও গাম্ভীর্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী।

বস্তুবাদী ও ভাববাদী, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, স্থায়ী ও আবয়বিক তদুপরি যবনিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় দৃশ্যপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল। কিন্তু এইগুলিকে বা এদের যে কোনটিকে দৃশ্যমান করে তোলার সার্থক পদ্ধতি কি ?

এক্ষেত্রে প্রথমেই দ্রষ্টার মানসিকতার অবচেতনস্তরটিকে অবশ্য জাগ্রত করতে হবে। পূর্বে যা কিছু বলা হল তার বাইরে আরো কিছু তাঁকে কল্পনা করে নিতে হবে। স্ব-অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেকে যথাযথ চালিত করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। অভিনেয় নাটকটি বারবার পড়া দরকার। এই সময় মনে যেমন যেমন প্রত্যয় এবং ভাবনা উঁকি দেবে, সেগুলোর একটা সম্ভাব্য নকশা তখনই তৈরী করতে হবে। একটি দৃশ্যকে আয়ত্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ধারণা অর্জনের পর স্থানকাল ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই পর্যায়ে অনেকগুলো নকশা করতে হবে এবং নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহনের দিগন্ত

খোলা রাখতে হবে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল খুঁজে বেড়ানোর মত অনিশ্চিত এবং ত্রস্ত হবে না। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রয়োজনীয় দৃশ্যাগুলোকে নানারূপে তৈরি করা যায়। তাই প্রত্যেকটি সম্ভাব্য বিষয়ে বিস্তারিত চিন্তা করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে। নকশাবিদ বা পরিচালকের ধ্যান ও রুচি মঞ্চসজ্জাতেই প্রকাশিত। সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, প্রত্যেকটি নাটকেই একটা নির্দিষ্ট মেজাজ থাকে যেটা আগাগোড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তিত হতে বা না হতে পারে। এই মেজাজ বা mood নাটকে একেশ্বর। একেবারে যবনিকা উন্মোচনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভাবটিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার এবং দর্শকচিত্তে প্রবিষ্ট করানোর জন্য পরিকল্পনাকার সচেষ্ট থাকবেন। নাটকের বিশিষ্ট বা জোরালো জায়গাগুলো তাঁকেই খুঁজে বের করতে হবে। নাটকের মেজাজ কোনখানে উদার বা সঙ্কুচিত, কোনখানে গভীর বা ব্যপ্ত হবে, এবং মঞ্চ প্রশস্ত না সংকীর্ণ হবে এই সবই ধার্য করার গুরু দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। দৃশ্যের আয়তন ও আকৃতির বিষযে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে তাঁকে প্রাসঙ্গিক ভাবেই জানতে হবে যে অভিনেতৃবর্গ যেহেতু যথেষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত হযে মঞ্চের ওপর চলাফেরা করবেন তাই তাঁদের চলাফেরার জন্যে যথেষ্ট স্থান রক্ষা করেই আসবাব-পত্র বসাতে হবে। নাটক প্রয়োগের সামগ্রিক সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি উপাদানকে কাজে লাগাতে হবে। নকশাবিদ নাটকীয় আবহাওয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজে তাঁর বিবেচনা শক্তিকে গভীরভাবে নিযুক্ত করবেন। দৃশ্যাঙ্কনে প্রযোজ্য বর্ণের নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁকে একথা বিবেচনা করতে হবে যে নির্বাচিত রংটির অভীধা যেন নাটকের মূল রসের একাঙ্গী হয়।

নাটকের সাধারণ অনুভাবটি জোরদার করার জন্য কিছুটা অতিকৃতির প্রয়োজন। এই অতিকরণ তিনটি উপায়ে সম্ভব : আকার, বর্ণ ও গতির বিকাশে। পরবর্তী বিবেচ্য হচ্ছে সেগুলির আত্মীকরণ। যে কোন শিল্প-কর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার নিজস্ব রীতি বা ষ্টাইল। আর এই শৈলীর মৌলিকত্বই হচ্ছে সৃজনশীল শিল্পীমনের অবদান। কৌতূহলী দর্শকমাত্রই

লক্ষ্য করেছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক অবদানে কোনো বিশিষ্ট শৈলীর প্রশ্ন আসে না। তাঁর মূল কথা হচ্ছে unity বা সমতা। অবশ্য যে কোন সৃষ্টিতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। পরন্তু শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব এই মৌলিকতা দিয়েই বহু সময় নির্ণীত হয়। মাঝারি দরের শিল্পীর সঙ্গে সেরা শিল্পীর তফাতটা এখানেই ধরা পড়ে।

নাট্যপ্রসঙ্গে এই স্টাইল বা শৈলীর কথা ভাবতে হলে অভিনেতা, মঞ্চ, আলোকসম্পাত, প্রয়োগ সব কিছুর সামঞ্জস্যের দ্বারা সার্থকতা সৃষ্টির কথাই অনুভব করতে হবে। একটি নাটকের গতি কখনো কোনো বিশেষ, কখনো বা বহুধা উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত। পরিকল্পনাবিদ, তাঁর সুতীক্ষ্ণ শিল্প-বোধ দিয়ে নাটকের উদ্দেশ্যটিকে প্রথমেই উপলব্ধি করবেন এবং নাটকের মূল মেজাজটিকে ধরতে চেষ্টা করবেন।

মানসিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলেই শিল্পীকে তাঁর নকশা ও মডেল গঠন করতে হবে। তাঁর পরিকল্পনা এবং মডেল সমূহ এখন একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে তৈরি হবে যাতে ছুতোর-মিস্ত্রী দৃশ্য নির্মাণ করবার সময় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কিছুকে সর্বদা অনুসরণ করতে পারেন। নির্দিষ্ট অর্থ-সমন্বিত মডেলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নাটকের মহড়ার সময় অভিনেতৃ-বৃন্দ পরিবেশের সঙ্গে বিন্দুমাত্র অপরিচয়জনিত বিস্ময় বা বিরক্তি বোধ করবেন না। এবং এরই সঙ্গে যথার্থ আলোকসম্পাতে নকশাবিদও তাঁর ঈপ্সিত ফল পাবেন।

লওয়াজিমা (Properties) বা আসবাবপত্র দৃশ্যসজ্জায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। নাটকের অভীষ্ট সিদ্ধিতে আসবাবের সার্থক ব্যবহার যে কোন গৃহস্থের সামাজিক অবস্থান, রুচি, মানসিকতা মায় গৃহসজ্জার মূলে স্ত্রী বা পুরুষের সক্রিয় হস্তের পরিচয়, নাটকের কালের সঙ্গে সমতা রক্ষা ইত্যাদি সবই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে যে নিখুঁত সময়জ্ঞান প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তা সামান্য শিথিল করা যেতে পারে, যেহেতু পোশাকের মত আসবাবপত্রের ফ্যাশন মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টায় না। এক্ষেত্রে কালচেতনা মোটামুটি বজায় থাকলেই হল।

মঞ্চসজ্জার স্বার্থে লওয়াজিমা বাছাই-এর আগে কাম্য এবং ফললাভের পক্ষে সম্ভাব্য বিঘ্নের বিষয়গুলিকে সযত্নে লক্ষ্য করতে হবে। এটা অনুভূত হওয়া দরকার যে একই সঙ্গে মঞ্চসজ্জা ও নাটকীয় আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলার কাজে আসবাবপত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো ব্যবহারের সময় তাই নাটকের প্রকৃতি ও অভিনীত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃকপাত করতে হবে।

অধুনা নাটকে বুক-কেস প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। সত্যিকার বই-এ ঠাসা একটি বুক-কেসের ভার খুব কম নয় এবং দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর অপসারণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে কোন বহির্বস্তু অপেক্ষা সুঅভিনয় দর্শক মনস্তত্বে অনেক বেশি ছায়াপাত করে। অন্যথায় আসবাবের পারিপাট্য দিয়ে নাটকের দুর্বলতা চাপা দেয়া যায় না।

যদিও একটা সুদৃশ্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলা যায় না, তবুও দৃশ্যটি বস্তুত প্রযোজিত নাটকটির ক্রমোন্নয়নের সহায়ক ছাড়া আর কিই বা? আসলে ফার্নিচার, কার্পেট, কুশন বা মঞ্চসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য রকমারি বস্তুর মধ্যে একটা সুরসঙ্গতি অবশ্যই অনুভব করতে হবে এবং দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তার শিল্পসম্মত সামগ্রিক ঐক্য ঘটাতে হবে। সুতরাং দৃশ্যপট ও দৃশ্যসজ্জার মত এসব ক্ষেত্রেও দৃষ্টিপাতের সমীকরণ অপরিহার্য। কারণ সামগ্রিক প্রযোজিত বিষয়টির অভ্যন্তরে একটি শৈল্পিক ঐক্যই কাম্য। একথাটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে। অথচ আমরা সাধারণত এটাই দেখি যে মূল অভিনয়ের আগের সন্ধ্যায় ড্রেস রিহার্সালের পূর্ব মুহূর্তে মাত্র প্রযোজকেরা পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য গা করেন। যদি সম্ভব হয় তবে দৃশ্যাবলীর পরিকল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের নকশা তৈরি করা সেরে ফেলতে হবে আর দৃশ্য নির্মাণের সময়েই সেগুলোকে প্রস্তুত করে ফেলতে হবে। কেবল মাত্র এইভাবেই নকশাকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। আদতে সব নাটকেই পোশাক-পত্রের ব্যাপারটা জরুরি। লক্ষনীয় যে ঐতিহাসিক নাটকে পোশাকের ব্যবহার দর্শককে যে ভাবে আকৃষ্ট করে আধুনিক নাটকে

সে সুযোগ নেই। তবু সে ক্ষেত্রেও অভিনয়ের বেশ কয়েকদিন আগেই পোশাক তৈরি করে ফেলা দরকার। নাটকে স্ত্রীচরিত্র থাকলে এটা আরও জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষদের পোশাক স্ত্রীলোকদের পোশাকের মত ঘন ঘন ও সমানহারে পালটায় না এবং সেগুলো তেমন উজ্জ্বল বা রঙিনও নয়। কাজেই পুরুষদের পোশাকের জন্য আলোকসম্পাত পরিকল্পনাও বিঘ্নিত হয় না। কোন অভিনেত্রী যখন নিজেই নিজের পোশাকের পরিকল্পনা করেন, তখন পরিচালকের নজর সেবিষয়ে কড়া হওয়া প্রয়োজন। অভিনেয়-চরিত্রের সঙ্গে যুৎসই হোক বা না হোক নিজেকে সোচ্চার করে তোলার গরজে যে সব আত্মকেন্দ্রিক অভিনেত্রী অন্য সব কিছুকে উপেক্ষা করেন, তাঁদের প্রতি নাটকের অখণ্ড ঐক্যের খাতিরেই পরিচালককে কঠোর হতে হবে।

মঞ্চ-সংরক্ষণ (Stage-management)

পরিচালকের পরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন স্টেজ-ম্যানেজার বা সূত্রধার। জটিল ও বহুমুখী দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। তাকে খুব নিয়মমাফিক ও চিন্তাশীল পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। যে কোন অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সামনে পড়ামাত্র তাঁকে বিষয়টি অনুভব করতে হবে ও যথাসম্ভব কর্তব্য পালন করতে হবে। জনসাধারণের স্বীকৃতির নেপথ্যে থেকে শুধু মাত্র মঞ্চের প্রতি অসীম মমতা নিয়ে, চাতুর্য এবং স্থৈর্য নিয়ে তাঁকে কাজ করে যেতে হয়।

মঞ্চশিল্পের সার্বিক ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা সূত্রধারের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। একজন সুযোগ্য সূত্রধারের মূল্য অসীম। কারণ তাঁর একার অযোগ্যতা নাটক প্রযোজনার আর সমস্ত প্রয়াসকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।

মঞ্চকার্য সম্পর্কে সূত্রধারের যথেষ্ট অবহিতি প্রয়োজন। অবশ্য খুব স্বাভাবিক ভাবে একজন দৃশ্য পরিকল্পনাবিদের বিস্তারিত জ্ঞান তাঁর থাকতে পারে না এবং সে আশা করাও তাঁর প্রতি অবিচার করাই হবে। চাতুর্যের

সঙ্গে কাজকর্ম চালিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, শরিফ মেজাজ ও চিন্তাশক্তি—এগুলোই তাঁর দরকার। আর তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধির তো প্রয়োজন বটেই, কারণ শেষ পর্যন্ত অবদানটিকে নাট্যরসিকের সামনে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলে ধরার বিপুল দায়িত্বের প্রায় সবটুকুই তো তার। কখনো নট-নটিদের বিসম্বাদ মেটানো, কখনো তাঁদের কাউকে তিরস্কার করা, কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে নরম-গরম হয়ে মানিয়ে চলা—এ নৈমিত্তিকতা তো তাঁর কাজে আছেই। নাট্যশালার কর্মীদেব মধ্যে জনপ্রিয়তা তাঁর চাই-ই। পূর্বেই বলেছি যে বহু নতুন নতুন বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব সব সময়েই হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা তাঁর মেজাজ ধীরস্থির রাখতে যথাসাধ্যের বাইরেও চেষ্টা করবেন। তাঁকে অবশ্যই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। গৃহীত সিদ্ধান্তকে অতি সত্বর কাজেও খাটাতে হবে। এই ভাবেই যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি সচল থাকবেন।

সূত্রধারের কর্তৃত্বের প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রায়শই দেখা যায় যে মৃদু-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বা ব্যক্তিত্বহীন সূত্রধারের পূর্ণ কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মঞ্চকর্মীরা তাঁকে কেবল মাত্র একজন দক্ষ মঞ্চ কুশলী হিসেবেই স্বীকার করেন। মূলত, ড্রেস রিহার্সালের সময় শুরু না করে বহু পূর্বেই সূত্রধারের কর্তব্য-কর্মে লিপ্ত হওয়া প্রয়োজনীয়।

পরিচালক ও সূত্রধারের দৃশ্যাদি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও বোঝাপড়া প্রথমেই সারতে হবে। যদি দৃশ্যাবলীকে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করতে হয় তবে সে ক্ষেত্রে পরিচালক দরকারী বিষয়গুলো নিয়ে সূত্রধারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন এবং কেবল দৃশ্য নির্মানের গঠন কৌশল খুঁটিয়ে দেখেই সূত্রধার এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন রকম স্বীকৃতি বা পুরস্কারের আশা না রেখেই কঠিন পরিশ্রমের জন্যে তাঁকে তৈরী হতে হবে। যাঁর আগ্রহ এ ব্যাপারে স্বাভাবিক ও গভীর নয়, এটা তাঁর ক্ষেত্র নয়। প্রযোজনাকে ভাল ভাবে চালু রাখতে হলে বহুল পরিমানে কঠোর ও নিরস কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হবে। অনুষ্ঠান সার্থক হলেই তিনি ব্যক্তিগত-কৃতিত্বের তৃপ্তি লাভ করবেন।

মঞ্চ-পরিবেশ সৃজন (Stage effect)

গ্রীক নাট্যবিদরা বহু নাটকেই প্রয়োজনমাফিক অনেক অসাধারণ মঞ্চ পরিবেশ সৃজনের কলাকৌশল তৈরী করে নিয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রীসিয় মঞ্চে চরিত্র অভিনেতাকে মঞ্চ থেকে অপসারিত করার এক বিচিত্র পদ্ধতি ছিল। বেশ একটা প্রশস্ত বোর্ড, যার ওপর বিদ্যুত ঝলকের প্রতীক অাঁকা থাকত, সেটাকে বেশ চোখে পড়ার মত অবস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হত। বজ্‌রবের সমতালে ঐ বোর্ডটিকে একদিক থেকে অন্যদিকে ঠেলে নেয়া হত। এর ফলে দর্শকদের প্রত্যয় হত যে সুবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেকসপীয়র তাঁর নাটকের জন্যে যন্ত্রপাতি, দৃশ্যাবলী ইত্যাদির সুযোগ নিতেন কিনা, এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তাঁর নাটক আদৌ সুসজ্জিত মঞ্চে অভিনীত হত কিনা, এ সম্পর্কেও সম্যক প্রশ্ন উঠেছে। আসলে শেকসপীয়র যথার্থই মঞ্চের মানুষ ছিলেন। এবং সে জন্যই তাঁর নাটকের অনেকগুলিতে 'a storm is heard', 'thunder and lightning' জাতীয় কথার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 'fretful elements' গুলিকে বোঝানোর উপকরণ সম্ভবতঃ তাঁর সময়ের নাট্যমঞ্চে মজুত ছিল।

উনিশ শতকে ইংলণ্ডের মঞ্চে মূল নাটক অপেক্ষা দৃশ্যাভাবকে ফুটিয়ে তোলার অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। এই শতকের প্রথম তিনটি দশকের মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস পাঠে আমরা বক্তব্যটির সমর্থন পাই। দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী তথাকথিত বাস্তবতা সৃষ্টি করারই নামান্তর হয়ে উঠেছিল এ সব। অভিনেতাকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন যন্ত্রবিদ। প্রতি রজনীর অভিনয় শেষে এমন সব নতুন নতুন দৃশ্যের উপস্থাপন করা হত যার ফলে প্রায়ই মূল নাটকের অমিল প্রকট হত। জ্বলন্ত বন, দুর্গ, কলকারখানা ইত্যাদির স-গর্জন চালনা, অপ্রয়োজনে বিস্ফোরণ ঘটানো নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে যে মঞ্চে আগুন লেগে যেতে পারে, তাতে যন্ত্রবিদ পরোয়া করতেন না। বহুবার এজাতীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আর একটি খুব জনপ্রিয় অথচ বিপজ্জনক রেওয়াজ ছিল আলোকমালায় সজ্জিত দৃশ্য, যা ছোট আকারের হাজার হাজার বাতি দিয়ে সাজান হত। গ্যাসের

আলো পরে এর স্থান দখল করে নেয়।

অতীতের কথা যথেষ্ট আলোচনা করা গেল। আমাদের মৌলিক প্রয়োজন বর্তমানের মঞ্চ এবং সেখানে নাট্যানুগ পরিবেশ সৃজন নিয়ে।

ম্যাজিক-লণ্ঠন

বৈদ্যুতিক আবহাওয়ার সৃষ্টির জন্যে বহু সময় ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যবহার হয়। একটা ফটোগ্রাফের প্লেট আলোর সামনে ধরে এবং ফিল্মের সাহায্যে সেটির ওপর বিদ্যুতের ছবি তুলে নিয়ে সেটিকে স্লাইড হিসাবে কাজে লাগানো যায়। মঞ্চের ব্যবস্থা যদি বাইরের দৃশ্য বোঝাতে তৈরি হয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবেশ তখন অন্যবিধ হবে। বজ্রপাতের পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে খুব দ্রুত ফ্লাশ লাইটের বোতাম ইতস্তত টিপে যাওয়া যায়। এর জন্যে যথোপযুক্ত যন্ত্র হচ্ছে আঠারো ইঞ্চিটাক দীর্ঘ কাঠের হাতলঅলা একটা লোহার ফাইল এবং সেই সঙ্গে আর একটা কাঠের হাতল—যেটার সঙ্গে এক টুকরো কার্বন লাগানো থাকে। একটা প্লাগের সঙ্গে জড়িত তারে ঐ ফাইল এবং কার্বন যুক্ত থাকে। একটা ফাইল থেকে যে তারটিকে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে একটা নির্দিষ্ট গুরুত্বের প্রতিরোধ-শক্তি পাওয়া যাবে এবং ফাইলের সঙ্গে কার্বনের সংযোগে বজ্রপাত ঘটবে।

বজ্রপাত

বজ্ররব হচ্ছে সেই জাতীয় ফল, যাকে বহু সযত্ন আয়োজনের মধ্যে পেতে হয়। প্রয়োজনের কালে মঞ্চের ওপরকার পরিস্থিতির সাযুজ্য বজায় রেখেই বজ্রপাতের আওয়াজটা জোরে কি আস্তে কি মাঝারি রকমের হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। ধীমান পরিচালক যন্ত্রবিদের বজ্ররব সৃষ্টির পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগের প্রতি পূর্বাহ্নেই নজর দেবেন। পুরোনো আমলে শাদামাটা ভাবে বজ্ররব ঘটানো হত। একটা খুব ওজনদার বাক্স থাকত যাকে থাণ্ডার বক্‌স্ বলত। বাক্সটার সঙ্গে বেখাপ্পা রকমের চাকা

লাগানো থাকত। করোগেটে মোড়া চাকাগুলির আয়তনও ছিল অসম। মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে এটিকে ঠেলে নিয়ে বাজ পড়ার আওয়াজ বোঝানো হত।

গ্রীকরা বজ্রবকে রূপ দেয়ার জন্য মঞ্চের নীচে একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করত।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ড্রুরি লেন থিয়েটারে একবার প্রসেনিয়মের ওপরের ফাঁকা জায়গাটিতে লোহার পাত বিছিয়ে তার ওপর দিয়ে রোলার ঠেলে ঠেলে ভূমিকম্পের অস্থিরতাকে রূপ দেওয়া হয়েছিল। বজ্রব-জনিত পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক বহু কৌশলই আছে। ছয় থেকে আট ফুট দীর্ঘ এবং তিন ফুট চওড়া কাঠের খণ্ড অথবা লোহার ঐ একই আকারের ঘন পাত দিয়েও বজ্রব বোঝানো যাবে।

বহু নাটকেই যথার্থ নাটকীয় পরিবেশ রচনার জন্য বৃষ্টিপাত দেখানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। কোথাও আগাগোড়াই বৃষ্টিপাতের এফেক্ট বোঝানো প্রয়োজন হয়। সমারসেট মম-এর 'রেইন' নাটকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত বোঝানোর জন্য শুরু থেকে যবনিকা-পতন পর্যন্ত একটানা ড্রামের আওয়াজ করা হয়েছিল। মঞ্চের আড়াল থেকে বৃষ্টিপাতের শব্দ উৎপাদন করার জন্যে ভাল করে ধোয়া এক ঝুড়ি বড় দানাযুক্ত বালি এবং তিনটে বিরাট আকারের কার্ডবোর্ডের বাক্স চাই। মঞ্চের মেঝের ওপর ঐ বাক্সগুলোকে সাজাতে হবে এবং ঝুড়িটাকে কোন উঁচু আর ওল্টানো কাঠের বাক্সের ওপর রাখতে হবে। এই কাজে যাঁকে লাগানো হবে, তিনি মুঠো মুঠো বালি নেবেন এবং এমন কৌশলে হাত থেকে ছিটিয়ে দেবেন যেন সেগুলো খালি বাক্সের প্রথমটিতেই ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে। এভাবে প্রথম বাক্সের চার ভাগের তিন ভাগ যখন ভরাট হয়ে যাবে তখন দ্বিতীয় বাক্সটিতে আগের মতই বালির দানা ফেলতে হবে। ইতিমধ্যে প্রথম বাক্সটির জমায়েত বালি যোগানদার ঝুড়িটিতে ফিরে এসেছে। যতক্ষণ বর্ষণ-মুখরতা বোঝানো

শেষ না হচ্ছে সে পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চালু থাকবে। এই যন্ত্রটি বানানো খুবই সোজা। বাক্সটিও সহজে তৈরী করা যায়।

বর্ষণ যদি বাস্তবিক দেখাতে হয়, তার আয়োজন নানা ভাবেই করা চলে। দর্শককে যদি বৃষ্টি জানলা দিয়ে দেখাতে হয়, সেক্ষেত্রে জানলাটার সঙ্গে মানানসই একটা দীর্ঘ ডুলি বা জলপ্রণালী স্থাপন করতে হবে—সেটা জানলার গঠনের সঙ্গে বেশ খাপ খাবে এবং লোহার ব্রাকেটের সঙ্গে ঝুলোনো থাকবে। ঠিক ঐরকমই তবে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় একটা ডুলিকে মঞ্চের নিকটবর্তী মাটিতে রাখা হবে। ওপরের জলপ্রণালীর কায়দামাফিক-ছিদ্র দিয়ে জল একেবারে নিচেরটিতে পড়বে। যখনই বর্ষণ-পরিবেশ কাম্য হবে তখনই ঝুলন্ত একটা ট্যাঙ্ক থেকে ওপরের ডুলিটিতে মন্থরভাবে জল ভর্তি করা হবে। একই কালে নিম্নবর্তী প্রণালীতে আবার ওপরটি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে থাকবে। প্রয়োজনমত বর্ষণ সৃষ্টি করার বহু সম্ভাব্য উপায় আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না। যে যাই করা হোক না কেন, তার দ্বারা যেন যথার্থ বর্ষণেরই পরিবেশ অনুভূত হয়।

বাতাস

অনেক রকম যন্ত্র আছে যেগুলির সাহায্যে বায়ুগর্জন স্পষ্টভাবে বোঝানো সম্ভব হয়। প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে এই—ড্রামের দুটো বৃত্তাকার দিকের সঙ্গে অনেকগুলো কাঠের টুকরো জুড়ে দিয়ে তারপর সেটাকে একটা ফ্রেমের ওপর দাঁড় করিয়ে হাতলের সাহায্যে ঘুরোতে থাকলেই স-শব্দ-বায়ুর বিভ্রম সৃষ্টি হবে।

লণ্ঠনের প্রয়োগ

ম্যাজিক লণ্ঠন, স্কিওপ্‌টিকন্‌, প্রয়োগ-লণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা বহু জাতীয় নয়নরঞ্জক দৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব। রঞ্জিত আলোকের যথাযথ প্রয়োগে বিস্ময়কর এফেক্ট সৃষ্টি করা যায়। মঞ্চের ওপর সবরকম শাব্দিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যোগ্য কর্মীদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মঞ্চ প্রদীপণ

মঞ্চে আলোকসজ্জা সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে আলোর ব্যবহার সম্পর্কে সামান্য ভূমিকার প্রয়োজন। আলোকের বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যে আমি 'আলো ও সভ্যতা' এই প্রসঙ্গটি বেছে নেবো। এক্ষেত্রে আধুনিক মঞ্চশিল্প সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে।

কৃত্রিম আলোক এবং সভ্যতা

প্রকৃতির প্রভুত্বে এবং তার করুণার পাত্র হিসাবে আদি-প্রস্তর যুগে মানুষের বিকাশ। আদিম বন্য নর প্রকৃতির দানের মাত্রার ওপর নির্ভর করে ভূরিভোজ ও অনশন দুই-ই চালিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুযায়ী তারা উষ্ণতার আমেজ ও কম্পন অনুভব করেছে। পশুর সহজাত অনুভূতি নিয়ে তারা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাশ্রয়ী হয়েছে, যেহেতু তখন তার পরে আর কোনো কাজ করা সম্ভব ছিল না। অন্ধকার যতই ঘন হয়েছে, বিপদের আশঙ্কা হয়েছে তত বেশী। কিন্তু অন্যান্য নিম্নস্তরীয় জীব অপেক্ষা মানুষের আশ্চর্য পার্থক্য সেখানেই যেখানে সে এক অপ্রতিরোধ্য স্বাধীকার-আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। এই আকাঙ্ক্ষাই তাকে সূচনা হতে প্রকৃতির হাত থেকে ক্রম-মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

দৈবের শৃঙ্খল এবং বহুযুগের তিল তিল অর্জিত সাফল্য মিলিত ভাবে মানুষের স্বাধীনতাকে একটু একটু করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে মানুষ যে উপায়ে কাজ করে, তার সৃষ্টির গোড়ার দিকে মানুষের শিশু-মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই সেই একই পদ্ধতিতে কাজ করে নি। এখন আবিষ্কার অনুভবকেই অনুসরণ করে আসে। দৈবযোগে সে একদিন হয়ত একটা আলোর ঝলকানি দেখেছিল যেটা ঘর্ষণজনিত আগুনেরই পরশমণি। মানুষের চিত্ত সেই হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল। সম্ভবতঃ একটা জ্বলন্ত কাঠের খণ্ড হাতে নিয়েই সে বোধ করেছিল সেই খণ্ডটি একদিন অন্ধকার অরণ্য থেকে মুক্তির অরণি হয়ে উঠবে। অন্ধকার জয়ের পথে মানুষ এইভাবেই সক্ষম

পদক্ষেপ ফেলেছে। এর ফলে সূর্যহীন প্রহরগুলিতেও মানুষের কর্মস্রোত বন্ধ হল না।

অধুনা কৃত্রিম আলো লাভ করবার পর্যাপ্ত উৎস ও উপকরণ আমাদের করায়ত্ব। আলোর সুগভীর শক্তি সম্পর্কে আমরা প্রত্যয়বোধ করেছি। যে ব্যক্তি একটানা দীর্ঘকাল আলোর ওপর নির্ভর করে হঠাৎ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন, করুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি মর্মে মর্মে আলোর অসাধারণ গুরুত্ব অনুভব করেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে মিল্টনের স্মরণীয় ছত্র কটি মনে আসে ঃ

"O first created being and thou great world
'Let there be light' and light was over all,
Why am I thus breaved of thy prime decree ?"

কিন্তু এই জাতীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আলোর জরুরী প্রয়োজন মানুষের যথার্থ উপলব্ধিজাত হতে পারে। কিন্তু শুধু কল্পনার বলেই মানুষ অনুভব করে যে আনন্দদানের উপায় হিসাবেও আলোর ক্ষমতা সর্বোপরি। অগ্রসর হওয়ার প্রবণতায় চালিত আদিম মানুষ একদিন সূর্যোদয়ের সীমানা ছাড়িয়ে তার কর্মধারাকে প্রসারিত করল। তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তখন আধুনিক রম্য বাসস্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। গৃহবৃত্তের উৎসার হল আলোকে। অরণ্যচারী মানুষ পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। সেই থেকে সভ্যতা-প্রভাবক শক্তি হিসেবে আলোক সক্রিয়। এমন কি এখনও বাসস্থান গৃহে রূপান্তরিত হয়, আলোর মাধ্যমেই। সাধারণত সূর্যাস্তের পরে পরিবারস্থ মানুষেরা গৃহে সমবেত হয়ে থাকে।

অন্ধকার থেকে মানুষ সর্বপ্রথম উদ্ধার পেল জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড বা ঐরকম কোন কিছুর মারফৎ। ক্রমশ এসেছে চর্বির বাতিদান ও ট্যালো-মোমবাতি। সূচনায় কয়েক শো বছর অবধি এ সবের উন্নয়ন বিশেষ শ্লথ ছিল। শতাব্দী তিনেক পূর্বেও এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তৎপরতা লক্ষিত হয় নি। ক্রমে দার্শনিক-করণের প্রচেষ্টা থেকে অনুসন্ধানের ইচ্ছা জাগল এবং সংগঠিত জ্ঞানের সূচনা হল। চূড়ান্ত সাফল্যে হয়ত কখনই আমরা পৌঁছব

না। প্রয়াসের সততার মধ্য দিয়ে মোটামুটি একটা লক্ষ্যে আমরা যেতে পারি, এই পর্যন্ত।

মানুষের আবিষ্কারগুলির মধ্যে কৃত্রিম আলোকের সৃষ্টি এবং যথার্থ ব্যবহার-কৌশল একটা অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী। সভ্যতার ওপর প্রভাব-বিস্তারী শক্তি হিসেবে অন্য কোনও আবিষ্কারই এককভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কৃত্রিম আলোক ব্যবস্থায় সময়ের কাম্য বণ্টন সম্ভব হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি আজ দেহকে সুব্যবস্থিত রাখার জন্য আট ঘণ্টা নিদ্রা, সংসারের কাছে দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে আট ঘণ্টা কাজ এবং বাকি আট ঘণ্টা ব্যয় করার মত নিজস্ব সময় পায়। এখন দেখা যাচ্ছে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার শিল্পীকরণের স্বার্থে আলো এক দ্বিতীয়রহিত ঘটনা হিসেবে উপস্থিত। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রগতি শান্ত হচ্ছে না বরং গভীর ও কেন্দ্রিত হচ্ছে।

কৃত্রিম আলোকের আবির্ভাব থেকেই অষ্টপ্রহর বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা সম্ভব হচ্ছে। যাঁরা রাত্রে লাইব্রেরিতে, যাদুঘরে, স্কুল-কলেজে কাজ করছেন, তাঁদের কথাই ভাবুন। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সত্তা তো কৃত্রিম আলোকের কৃপাতেই টিঁকে আছে। চলচ্চিত্রেও এর অবদান ব্যাপক। কৃত্রিম আলো আনন্দোৎসবের পরিবেশ রচনাতেও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী।

মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে, যখন রাত্রি পথচারীর কাছে বিপজ্জনক ছিল, তখন থেকেই পূর্ব পুরুষেব উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আমরা আলোর গুণাবলীতে কিছু কিছু রূপকের আরোপ করেছি। প্রতীকী অর্থে আলো বলতে বুঝেছি সত্য, আত্মিক উন্নয়ন, জ্ঞান ও প্রগতি। নানাবিধ সংস্কৃতিমূলক উৎসবে আলোকের এবং বর্ণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রকাশ অত্যন্ত অগ্রবর্তী অংশ নিচ্ছে। সে সময় অদূর নয়, যখন আলো ও বর্ণের সিমফনি অন্য সব শিল্পকে পরাস্ত করে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আলো নৌবিদ্যাকে অপরিমেয় সাহায্য করেছে। সর্ব পৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে এর সংকেতে জলস্থলআকাশে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধগুলিতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেও আলোর ব্যবহার হচ্ছে এবং

কৌশলের সঙ্গে বিমান আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়াতে বিগত বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য জীবন রক্ষা পেয়েছে।

আজকাল গাছপালা, কৃষি এমন কি পশুপালনের উন্নতিকল্পেও আলো-কে কাজে লাগানো হচ্ছে। সূর্যের সপ্তাশ্ব-বর্ণের কৃত্রিম প্রয়োগে একালে বিজ্ঞানীরা নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করছেন এবং জন-মঙ্গলের ধারাটি ক্রম-পরিণত হচ্ছে। কৃত্রিম আলোক আমাদের শুধু মাত্র দিবালোকের এককত্ব থেকেই মুক্তি দেয়নি, পরন্তু দিনের আলো পেরিয়ে আমাদের কর্মের পরিধিকে অনেকদূর ব্যাপ্ত করেছে। যে সব ক্ষেত্রে সাধারণ আলোর ব্যবহার অসম্ভব, সেই সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম আলোর প্রয়োগে আমরা সিদ্ধকাম হয়েছি।

এই কৃত্রিম আলোকব্যবস্থায় একটা নতুনতর পেশা বা জীবিকার উদ্ভব হয়েছে। যেমন বৈদ্যুতিক কারিগরী পেশা। অন্য বহু জীবিকা থেকে এই কাজটি বেশ জটিল। আলোকসৃষ্টি ও প্রয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান যার আছে এমন একজন কারিগরকে নিছক আলো ছাড়াও স্থাপত্য, বর্ণ, শারীরবিদ্যা এবং মনস্তত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বোধ সম্পন্ন হতে হবে। বিজ্ঞান ও শিল্পের যে বিভাগগুলিতে কৃত্রিম আলোর কমবেশি প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা আছে, সেগুলি সম্পর্কেও তাঁকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কেবল প্রাকৃতিক আলোকের অভাবমোচনের অস্ত্র হিসেবেই নয়, কৃত্রিম আলোর ব্যবহারের নৈপুন্যে সভ্যতার অগ্রগতিই প্রমাণিত হয়। এবং একথা অবশ্যমান্য যে কৃত্রিম আলো ও নাট্যশিল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আলো

রঙ ও আবেগমূল্য

প্রতিটি মানুষের মানসিকতার স্বাতন্ত্র্যের দরুণ রঙের প্রভাব বা ভাবমূল্যের বিষয়টি অত্যন্ত জটিলতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। কারণ বিভিন্ন রঙের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষেরই আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন ভাবাবেগ বা আবেগপ্রবণতা আছে।

প্রতিটি রঙ বা তাদের বিভিন্ন সমষ্টি আনন্দদায়ক, উদ্দীপক, সাদামাটা, শান্ত, বিষন্ন, উষ্ণ, শীতল, কঠোর, রাজকীয়, দুর্বল বা প্রভাবশালী হতে পারে। এবং রঙ নিয়ে যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রেই এগুলো মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

লাল বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই একটি উত্তেজক রঙ। এটা দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ ধরণের কাজ একই সময়ে অন্যান্য সাধারণ আলোর তুলনায় লাল আলোতে বেশী করা যায়। যাই হোক, এটা অন্যান্য উত্তেজকের থেকে বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রাসঙ্গিক ভাবেই একথা বলা চলে যে, বস্তুর রঙের চেয়েও আলোর রঙ আবেগ সঞ্চারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী শক্তিশালী। আলো যার উপর পড়ে তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে সক্ষম। কিছু বস্তুর রঙের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত রঙীন আলো কাছাকাছির বস্তুগুলি ছাড়া আর কাউকেই উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না, যদি না সেই

রঙ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ঘরের সকল বস্তুর সমস্ত তলগুলোই লালের শেড (shade)। টিন্ট (Tint) ও অমিশ্র রঙের বিভিন্নতায় রাঙিয়ে তুলতে হবে যদি লাল আলো ব্যবহারের সমান ফল পেতে হয়।

লাল আলোর উত্তেজক ও উদ্দীপক প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েই বলা চলে যে, তার ঘনত্ব মান ও মাত্রা পাল্টে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। হয় তো মাঝারি রকমের আভার সাহায্যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জীবন্ত পরিবেশ রচনা করা যেতে পারে ; আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উদ্দীপনা জাগাতে অত্যন্ত গাঢ় আভা প্রয়োজন। ক্ষেত্রবিশেষে খাওয়ার ঘর, শোয়ার ঘর, নাচঘর বা হোটেলে হালকা ধরণের লালচে গোলাপি (Reddish-purple) সাধারণ ভাবে যাকে গোলাপি বলা হয়ে থাকে তার ব্যবহার আনন্দদায়ক তথা জীবন্ত বলে মনে হয় যদিও তা একটি শান্ত পড়ার ঘরের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

কমলা ও পীত ঈষৎ উদ্দীপক উষ্ণ রঙ বলেই এগুলোর বৈশিষ্ট্য সব থেকে ভালোভাবে বোঝান যায়। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে অন্তর্দৃশ্য পরিকল্পনায় অর্থাৎ ঘরের ভেতর সাজানো বা আলোকিত করার সময় পীত বা হলদের বিভিন্ন মাত্রা (হালকা বা গাঢ) সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। নিঃসন্দেহে অন্তর্দৃশ্যকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার ইচ্ছে থেকেই এই রঙের ব্যবহার। রক্ষাকর্তার প্রাথমিক ও মৌলিক দায়িত্ব ঘর বা বাস-গৃহই পালন করে। ঘরই আমাদের শীত, তাপ, বৃষ্টি, বাতাস আর বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। বাসস্থান বলতে আরামই বোঝায়—ঘর আরামের প্রতীক। কাজেই একেবারে প্রথম দিকের আলোক প্রজ্জ্বালক-গুলোর রঙ ছিল উষ্ণ, অসম্পৃক্ত হলুদ বা পীত। এই প্রভাবের ফলেই মনে হয় আজকের মানুষের ইচ্ছা হয়েছে আধুনিক আলোক প্রজ্জ্বালকগুলোর রঙও উষ্ণ পীতাভ করার। যাই হোক, এরকম ক্ষেত্রে পীতাভ রঙ (Amber) ব্যবহার করে একটা ভুল প্রায়ই করা হয়। কারণ এই বিশেষ রঙটি সবজে-হলুদ হওয়ায় সাধারণতই উজ্জ্বলতার খাতিরে নয়ন-মনোহর হয় না। হাল্কা

ধরণের সবজে-হলুদ (tint of greenish yellow) যে জনপ্রিয় পছন্দসই নয়, আর সাধারণতঃই আলোকসম্পাতে এই রঙ যে অনভিপ্রেত তার স্বপক্ষে প্রচুর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কোনো ঘরের বা অন্তর্দৃশ্যের আলোক প্রজ্জ্বালক বা সুন্দরতর করে তোলার জন্য ব্যবহৃত প্রধান প্রধান সজ্জা সংক্রান্ত বস্তুগুলো যদি গাঢ় আভার হলুদ (deep yellowish tint) রঙের হয় তাহলে গ্রীষ্মের কোনো কোনো সময়ে সেই ঘর যতদূর মনে হয় পীড়াদায়ক বা কষ্টকর রকমের গরম বলেই মনে হবে।

বোধ হয় প্রকৃতিতে প্রচুর জায়গা জুড়ে সবুজ রঙের অভিযোজনের ফলেই তা নিরপেক্ষ রঙের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। সাধারণ ধারণার তুলনায় প্রকৃতির সবুজ রঙ অনেক বেশী গাঢ় বা ঘন। যদিও সবুজ একটা আরাম-দায়ক রঙ আর তাই সবার পছন্দসই ও শোভন, তবুও এটা সর্বক্ষেত্রে মনোরম বা উপযোগী না হতেও পারে। যেমন, আলোর সাহায্যে কোনো বিশেষ ফললাভের জন্যে সবুজ আলো হয়তো অত্যন্ত সুন্দর কাজ করে কিন্তু সবুজ আলোর তলায় মানুষের মুখ সাধারণতঃই অত্যন্ত অশোভনবিসদৃশ হয়ে পড়ে।

নীল তার আভা (tint) আর ঔজ্জ্বল্যের (hue) উপর নির্ভর করে শান্ত, স্থির, ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজভাব বা বিষণ্ণতার প্রতীক হ'তে পারে। সবুজের থেকে যতই এই রঙ দূরে সরে যায়, নিরপেক্ষতা, প্রশমতা বা প্রশান্তি থেকেও ততই সে দূরে সরতে সরতে একেবারে বিমর্ষতার কোলে ঢলে পড়ে। দেবভূমি বা জ্ঞানের জগত বললে আকাশ যে ধারণার সৃষ্টি করে, এই রঙ সেই ধরণের আলো বা ভাব জাগিয়ে তোলে। যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যেই নীলের আধিক্য কখনও কখনও একটি ঐক্যের সুর জাগিয়ে তোলে। নীল ও নীল-সবুজের শান্ত ও শীতলতার মানসিক তথা শারীরিক প্রভাব অনেক সময়েই অভিপ্রেত হয়ে পড়ে, যদিও এসকল গুনাবলী প্রয়োজনীয়ও বটে। যেমন ভরা গ্রীষ্মে কোন প্রেক্ষাগৃহকে শান্ত রঙে রঙ করা হলে এবং নীল-সবুজ (blue-green) আভার (tint) আলোকে সজ্জিত করলে তা তখন অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক হয়। এমনকি বসবার জায়গার আচ্ছাদনেও নীলাভ (bluish-

tint) রঙ শান্ত অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। অনেকক্ষেত্রেই শৈত্যের অনুভূতি আনতে সক্ষম এমন রঙীন আলো (illuminant) ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে সাধারণভাবে আলোকিত (general lighting) করতে রঙীন আলোর ব্যবহারের বেশীও ভাগ ক্ষেত্রেই, বর্ণের আভা বা (tint) যা অনুভব করা যায় কিন্তু খুব বেশীরকম দৃশ্যমান নয় তা সে সব আলোক-সম্পাতে অনেক বেশী খাঁটি রঙ (pure colour)-এর প্রকাশ তার চাইতে বেশী অভিপ্রেত, যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা অতিরিক্ত পরিমানে চোখে পড়ে। সাজানোর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খাঁটি রঙের চেয়ে রঙের হালকা আভা যে অনেক শক্তিশালী এ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার দরুণই এসব কাজে অনেকসময়েই রঙীন আলোতে খাঁটি রঙ (pure colour) ব্যবহার করা হয়।

কালোরঙ বা অন্ধকারের আবেগমূল্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রত্যেকেরই আছে। এটা রহস্যের ইঙ্গিত দেয় এবং ভীতি জাগিয়ে তোলে। মৃত্যুর সঙ্গে মিল থাকার দরুণ এর কিছু বিশেষ ক্ষমতা বর্তমান। রঙটি গাম্ভীর্য-পূর্ণ এবং সৌন্দর্য-বিধায়ক।

সাদা রঙ কালোর ঠিক বিপরীত। বহুক্ষেত্রেই এটা কালোর চেয়ে বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য। এতে শুদ্ধতা আর পবিত্রতার প্রকাশ। কালোর মতই সাদা নিষ্ফলতা বা শূন্যতার ইঙ্গিত বহন করে। কালোর সঙ্গে এর ব্যবহারে বৈপরীত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। সব রঙের চেয়ে উজ্জ্বল হলেও আলো বললে উজ্জ্বল পীত বর্ণের আভা (tint of warm yellow) যা বোঝায় এটায় তা বোঝায় না। হাসপাতাল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ আলো পরিত্যক্ত হচ্ছে, কারণ এর প্রখরতা। অনেক জায়গাতেই, জিনিসের এমনকি কোনো জিনিসের পশ্চাৎপট হিসেবেও খুব হালকা খয়েরি রঙ বা তার আঁভা দিয়ে সাদার তীব্রতাকে নমনীয় করে আনাই শ্রেয়।

ধূসর রঙর আবেগমূল্য কালো এবং সাদার অন্তবর্তী। এতেও নির্দিষ্ট পরিমাণে গাম্ভীর্য বর্তমান। যদিও সাধারণত ধূসর রঙকে নিরপেক্ষ (neutral) বলা হয় তবুও এতে কখনো কখনো বিমর্ষতা প্রকাশ পায় এবং সাধারণ ভাবে এটা সাদার চেয়ে শান্ত। বস্তুত এই রঙটির

আবেগমূল্য একেবারেই নিরপেক্ষ নয়। ধূসর বর্ণ তৈরি করতে কালো এবং স্সাদার মিশ্রণই প্রচলিত। সাধারণত এতে একটা নীলচে ধূসর রঙ বেরিয়ে আসে এবং উজ্জ্বল আভার (warm tint) ধূসর রঙের চেয়ে এটা অনেক বেশী শান্ত ও কম চিত্তাকর্ষক। বহু ছায়াই হয় ধূসর নয়ত গাঢ় মাত্রার (shade) কোনো রঙ। আলোক-ব্যঞ্জনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

বিভিন্ন রঙের মাত্রা (বা গভীরতা) অর্থে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হ'ল তাদের পরস্পরের মধ্যে একটু সজাগ পৃথকীকরণের অভ্যাসের সাহায্যে একজন বুদ্ধিমান লোক অতি সহজেই এ সব বিভিন্ন রঙের ব্যাপারে তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে পারে।

রক্তবর্ণ (Crimson)—আবেগের অনির্দিষ্ট প্রকাশ, রক্ত বা বিপদ। উত্তেজক অথবা অতিরিক্ত উদ্দীপক।

কমলা (Orange)—উষ্ণ, বিরক্তি-উৎপাদক, এমন কি শ্বাসরোধকারী।

কমলা-হলুদ (Orange Yellow)—উষ্ণ, উজ্জ্বল, জীবন্ত।

পীত (Yellow)—আমুদে, প্রফুল্ল, সুখী, অথবা প্রাক-প্রবেশিকা। এটা ক্লান্তিকর বা নিদারুণ বিরক্তিকর হতে পারে।

সবুজ (Green)—শান্ত, নিরপেক্ষ, পৌরুষদৃপ্ত।

নীলচে (Bluish)—স্থির, মার্জিত, ঠাণ্ডা, প্রশান্ত।

বেগুনি (Violet)—অনমনীয়, বিষণ্ণ, বিমর্ষ।

বেগুনি-লাল (Purple)—রাজকীয়, জাঁকালো, প্রভাবশীল।

রঙের আবেগমূল্য নিয়ে অনুধাবন করার সময়ে মনে রাখা ভাল যে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন রকমের উত্তর পাই। সাধারণ সূত্রগুলো যেগুলো অনুসরণ করে রঙ মানুষকে প্রভাবিত করে তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিচে দেওয়া হল :—

বস্তুগত দিক (Objective Aspect)—একেবারেই রঙের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য, যেমন ঔজ্জ্বল্য, গাঢ়তা, পূর্ণতা, সূক্ষ্মতা, মালিন্য, পঙ্কিলতা, বিশৃঙ্খলতা, এগুলিই রঙের প্রভাবিত করতে পারা না

পারার ভিত্তি হতে পারে।

শারীরিক দিক (Physiological Aspect)—রঙ দর্শকদের শারীরিক প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তারা কখনো মানানসই, বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর, উজ্জীবক বা উদ্দীপকও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক দিক (Associative Aspect)—এর দ্বারা রঙের ইঙ্গিত বহন করার ক্ষমতা বোঝায় আর তার ফলে মনে যে প্রাসঙ্গিকতার উদয় হয় তা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য কোনো বিশেষ লোকের রঙ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকতাব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে, অতীতের বিশেষ কোন কোন স্মৃতি তার থাকতে পারে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Charactor Aspect)—এতে রঙের নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করার ক্ষমতা বোঝায় যা নাকি কোন মানুষের চরিত্র, বা মেজাজকে ফুটিয়ে তোলে। এটা খুবই জটিল বিষয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবিষ্কারকেরা কদাচিৎ এই জগতে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে রঙের প্রভাব ও প্রতি-ক্রিয়া হঠাৎ এসেপড়া কোনোস্মৃতি বা ব্যক্তিগত বিষয়-নিরপেক্ষ রঙের এই দিকটি হচ্ছে তার প্রভাবিত করার ও প্রকাশ করার ক্ষমতার দিক এবং শিল্পগতভাবে এর স্থান সর্বোচ্চে।

একটি বিশেষ পরীক্ষা আলোর এই আবেগমূলাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। একটা বড় গোষ্ঠি, যার মধ্যে পুরুষ ও মেয়ে দুই-ই ছিল, তাদের সামনে ২৯টি রঙের একটি তালিকা রাখা হয়েছিল। রঙগুলি বর্ণালীর ক্রম অনুসারেই একটি ধূসর পশ্চাৎপটের উপব সাজানো হয়েছিল এবং ব্ল্যাক-বোর্ডে ২০টি বিশেষণের নাম লেখা ছিল। যদিও বিশেষণগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো ছিল তবুও এগুলোকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়, যার দ্বারা বোঝায় বর্ণগুলি উত্তেজক (exciting), প্রশান্তিকর (tranquilising) অথবা অবদমনকারী (subduing)। উপস্থিত সবাইকে এর মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের জন্য একটি করে নাম (বা অন্য কোন বিশেষণ

যদি তাদের মনে হয়ে থাকে) বলতে বলা হয়েছিল যা নাকি রঙগুলোর অনুভূতি বা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে তুলে ধরে। কেন তাদের রঙগুলো ভাল লেগেছিল বা লাগে নি শব্দগুলো তারই ইঙ্গিত দিয়েছিল। সমানভাবে মেয়ে-পুরুষে বিভক্ত কলেজের ৬৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে যে মতামত পাওয়া গিয়েছিল তার তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ—

আলোর সাধারণ তিনটি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কলেজের ৬৩ জন ছাত্রছাত্রীর মতামতের তালিকা

রঙ (Colour)	উত্তেজক (Exciting)	প্রশান্তিকর (Tranquilising)	প্রশমনকর (Subduing)
রক্তবর্ণ (Crimson)	৪১	০	১০
পীতাভ-লাল (Scarlet)	৫৬	০	০
গাঢ়-কমলা (Deep Orange)	৫৯	০	০
কমলা-পীত (Orange-Yellow)	৫৫	৬	০
পীত (Yellow)	৫৩	৬	০
পীত-সবুজ (Yellow-Green)	১৪	৩১	৫
সবুজ (Green)	২৮	৩২	০
নীল-সবুজ (Blue-Green)	৩২	২৩	৬
নীল (Blue)	১১	২১	৩০

রঙ (Colour)	উত্তেজক (Exciting)	প্রশান্তিকর (Tranqulising)	প্রশমনকা (Subduing
বেগ্‌নি-নীল (Violet-Blue)	০	১৭	৪৫
বেগ্‌নি (Violet)	০	৬	৫৪
নীল-বেগুনি বা রক্তবেগুনি (Purple)	৩	১	৪৮

রঙ ও প্রতীকী-চেতনা

রঙ বা বর্ণের প্রভাব ও প্রকাশ ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যাদি জানার প্রচুর উৎস বর্তমান। আলো আর রঙের প্রতীকী-সংখ্যা অগুনতি এবং সেগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, প্রথা, নিয়তিবাদ আর সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সমস্ত প্রতীকী ধারণাগুলো পুরাণ, কথাসাহিত্য এবং দৈনন্দিন আচরণে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে যদিও এটা ঠিক যে সেগুলো শতাব্দী-পরম্পরা ধরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পালটেছে—উন্নত হয়েছে। প্রচলিত প্রতীকের ধারণামত আলো ও রঙের ব্যবহারের ফল সম্পর্কে অনেক বেশী নিশ্চিত, নিরাপদ হওয়া যায়, যেটা সাধারণতই রঙের ইচ্ছেমত ব্যবহারে হয় না।

মানবজাতির প্রথম দিনটি থেকেই প্রকৃতি তাকে প্রভাবিত করে আসছে। প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ নানা ধ্যান-ধারণা আর মেজাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, সেগুলোতে কিছু কিছু গুণ আর প্রতীকী ধারণা আরোপ করেছে। বেড়ে-ওঠা গাছপালার সবুজ রঙ জীবনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং তারই সম্প্রসারণ সম্পর্ক গড়েছে স্মৃতির সঙ্গে। আর জীবনের স্মারক হিসেবে সবুজ রঙ তাই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ধারণার সঙ্গে "চির সবুজ" এই প্রতীকে যুক্ত হয়েছে। ফসলের রঙ ফললাভ আর প্রাচুর্যের ধারণা দিতে সক্ষম। হেমন্তের কপিশ, পিঙ্গল বা বাদামী রঙ নিরানন্দ, মলিন আর বিষন্ন, কারণ সুন্দর, উপভোগ্য গ্রীষ্মের ঘোষণার জন্যই হেমন্তের যেন আগমন। শীতের দুঃসহ দিনগুলোর ধ্যানগম্ভীর চিন্তা আর পরের বসন্তের জন্য নিরানন্দ প্রতীক্ষাও মনে হয় হেমন্তের বিষন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এরকমভাবেই বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন রঙ যথাযথ ধারণার সঙ্গে ক্রমেই জড়িয়ে পড়েছে।

শান্ত স্নিগ্ধতার প্রতীক নীল আকাশ। পুরাণে আকাশকে স্বর্গীয় আত্মা-সমূহের বাসগৃহ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। স্বভাবতই আকাশের রঙ স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও উন্নত বোধির গুণ অর্জন করেছে। অন্যদিকে ধূসর বর্ণাচ্ছাদিত

আকাশ হতাশা, উদ্যমহীনতা ও মনমরা ভাবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সূর্য অস্ত যায়—তার মহিমান্বিত আশীর্বাদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ রঙের আভায় ঝরে পড়ে আমাদের উপর। এবং রঙের প্রকাশক্ষমতায়, রঙের ভাষায় অস্তরবির এই দান প্রচুর, প্রচণ্ড, অপরিমেয়।

এই সকল উৎসরাজি থেকে আলোর বিভিন্ন গুণ পুরাণের ভাসা ভাসা ধারণার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। মানুষের শৈশবকালে স্থূল কল্পনার গতি ছিল অবাধ। জগত তার চিন্তার মধ্যে ছিল অতিপ্রাকৃতের আধিক্য; জড় পদার্থগুলোতেও মানবীয় ক্ষমতা আরোপ করা হত। অগম্য, অব্যবহৃত, অপ্রচলিত জায়গাগুলোই কল্পিত হত দেবতাদের পীঠস্থান হিসেবে। সেকালের এই চিন্তাধারণার প্রাপ্য অংশ রঙও পেয়েছে—রঙ সম্পর্কে বিভিন্ন কল্পিত গুণাবলীর উদ্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমেই, আমাদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর রঙ কি রকম ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল তা খানিকটা বোঝা যায়। এখন প্রায় সকলের কাছেই সব রঙের স্থায়ী ও স্বীকৃত প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। রঙের এই সকল গুণরাশি অনেকের কাছেই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাস্তব ছিল। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য, যে মূলতঃ ঐগুলো কল্পনার দ্বারা আরোপিত। শব্দের মতই ক্রমসংযুক্তি আর জনস্বীকৃতির মাধ্যমে ঐগুলো বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পুরাণে রঙের সঙ্গে যে বিশেষ বিশেষ গুণ, ধর্ম বা ধারণার সংযোগ করা হয়েছিল সেগুলো আধুনিক সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে এবং সুন্দর, সংবেদনশীল কবিকল্পনা সেগুলির সঙ্গে আরও কিছু কিছু ভাব ও ধারণা যোগ করেছে।

পুরোনো দিনের ভাষা রঙের নামের অপ্রতুলতাই প্রকাশ করে। ফলে বিভিন্ন অভিব্যক্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, এই স্বল্পতা আমাদের পুরোনো দিনের রুচি আর জ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানতেও সাহায্য করে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে যদি রঙের ব্যাপারে সাদৃশ্য বা প্রাসঙ্গিকতার ধারণা বাদ দেওয়া যায় তাহলে অত্যন্ত আধুনিক মানুষও সে সম্পর্কে প্রাচীনই রয়ে গেছে। পুরাকালের প্রায় প্রতিটি ভাষাতেই লাল রঙের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সাধারণভাবে বলা

যায় এবং সাধারণ ভাবে বলা যায় রঙের মধ্যে লালই প্রথম ব্যবহৃত হয়। ক্রমানুসারে পীত বা হলুদের স্থান ছিল তার পরেই। সবুজের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনুন্নত সভ্যতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়, আর নীলের উল্লেখ প্রায় ছিল না বললেই চলে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এটা বলা চলে যে রঙের এই নামকরণ ও ব্যবহার বর্ণালীর লালের প্রান্ত থেকে সুরু হয়ে নীলের দিকে এগিয়েছিল এবং বর্ণের নামকরণের এই প্রাথমিক কালে কমলা, নীলচে-সবুজ (blue-green) ইত্যাদি সংক্রমণগত বা মধ্যবর্তী রঙের অস্তিত্বই ছিল না। এমন কি আজকের দিনেও উন্নত রঙের ধারণা নিয়েও আমরা অনেকে নীলাভ-সবুজ (bluish-green) নীলচে-সবুজ (blue-green) এবং সবজে-নীলের (greenish-blue) মধ্যে গোলমাল করে ফেলি। আমাদের আধুনিক ভাষাও বর্ণালীর নীলাঞ্চলের থেকে রক্ত ও পীত অংশের বিভিন্ন নামকরণেই বেশী সমৃদ্ধ।

প্রাচীন মানুষ পীত এবং কমলা, নীল এবং নীলচে-সবুজ-এর (blue-green) মত বর্ণালীর ঘনভাবে সংযুক্ত রঙগুলির ক্ষেত্রে প্রায়ই এক নাম ব্যবহার করত। কালো, নীল বা বেগুনীর মত ঘনকৃষ্ণ বর্ণের রঙগুলোর ক্ষেত্রেও প্রায়ই তাদের একটি নামই ব্যবহার করতে দেখা যেত। এগুলো হয়তো কিছু পরিমাণে পৃথকীকরণের ক্ষমতার অভাবের কথাই বোঝায়। কিন্তু আরও বেশী পরিমাণে যা ব্যক্ত করে তা হল প্রয়োজনের অনুপস্থিতি। একের থেকে অপরকে আলাদা করে চাক্ষুস করার ধারণা প্রাচীনকালে ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু রঙের জগতের সূক্ষতর অনুভূতির ব্যাপ্তিও ছিল সন্দেহাতীতভাবে অনুপস্থিত। প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির উপরই নির্ভর করে মানুষের রুচি আর অনুভূতি। আর এগুলো থেকেই নির্ণীত হয় সভ্যতার স্তর। বিভিন্ন রঙের ব্যাপারে মানবদেহের সংবেদনশীলতাকে পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাবিত করে, ফলে সেই সব রঙের নামকরণেও পরিবেশের প্রভাব পড়ে। যাই হোক, আলস্য হল আদিম যুগের সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার বিভিন্ন আবিষ্কারই সম্ভব হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাই তত্ত্ব

অনুসারেই যখন প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে শুধু তখনই প্রাচীন মানুষ রঙের আবিষ্কার ও তার নামকরণ করেছে।

প্রকৃতিতে লালের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কমই বলা চলে এবং সে কারণেই যখন তা দেখা যায় তখনই তা মনোহর, চিত্তাকর্ষক। প্রকৃতিতে লালের আপেক্ষিক কম সংঘটন বা উপস্থিতিই মনে হয় ভাষায় তাকে প্রথমে স্থান করে দিয়েছে। আবার ফল ও মাংসের সঙ্গে লালের প্রাসঙ্গিকতাও তার প্রথম নামকরণের কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। বৃক্ষপত্রের সবুজ আর নভোমণ্ডলের নীল প্রকৃতিতে অত্যন্তই সাধারণ এবং সেহেতু লালের মত চমকপ্রদ নয় বলে এক সঙ্গে বিবেচিত হওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। আবার সবুজের বিভিন্নতাই হয়তো নীলের আগে সবুজের নামকরণের কারণ। শুধু আকাশের নীল ছাড়া প্রকৃতিতে নীল রঙের প্রকাশ অন্যান্য রঙের তুলনায় অনেক কম বললেই চলে। নীলের বিভিন্নতার পার্থক্য সূচিত করার ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা আর ব্যবহারিক প্রয়োজনের স্বল্পতাই মনে হয় প্রাচীন ভাষায় তার স্থানকে সীমিত করেছিল। বাস্তবিকই, বাইবেলে শতাধিক বার (চারশত) আকাশ বা স্বর্গের উল্লেখ থাকলেও কখনই নীল রঙের কথা বলা হয় নি, বেদেও অনেক ক্ষেত্রেই আকাশ নীল হিসেবে বর্ণিত হয় নি। ঋক্ বেদে কখনই পৃথিবীর রঙ গাছপালার মত সবুজ বা আকাশের রঙ নীল বলে উল্লিখিত হয় নি।

অভিনয়

অভিনেতার কাছে অনুভূতির স্মৃতি

স্মৃতি কিভাবে কাজ করে? এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক কোন একটা জরুরী পরিস্থিতিতে একজন তার বন্ধুর ফোন নম্বর খুঁজে পেতে চায়। যে পদ্ধতিতে সে সেটা পেতে পারে, তার আলোচনা করা যাক। সে ডাইরেক্টরি নিল ও তার পাতাগুলোতে নম্বরটি খুঁজতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সেটি পেল। ধরা যাক সেটি ৪৬৪২৪২। দৃষ্টির মাধ্যমে নম্বরটি তার মাথায় দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে। কেউ হয়তো বলবেন, নম্বরটি সে ভুলে যেতে পারে। এটা নির্ভর করে, যে নম্বরটি দেখছে তার ক্ষমতার উপর। নিশ্চিত বলা যায় যে কোন প্রাণী কোন কিছু থেকে যদি অনুভূতি সঞ্চয় করে তবে সেটা সে কখনো ভোলে না। ধরা যাক, বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখায় এমন একজন প্রশিক্ষকের কথা। প্রশিক্ষণের সময় সে একটি তপ্ত লাল লোহার রড ব্যবহার করে এবং এসময় জন্তুগুলো যদি তাকে আক্রমণ করতে আসে তবে উত্তপ্ত লোহার রডটি সম্পর্কে তাদের যন্ত্রনাদায়ক অনুভূতি হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির স্মৃতি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ায় প্রশিক্ষণের পর সার্কাসে খেলা দেখানোর সময় তপ্ত রডের পরিবর্তে যদি ব্যবহৃত হয় লাল রং করা রড। রডটি দেখামাত্রই জীবটি এর মর্মার্থ বুঝে নেয়, পূর্বের যন্ত্রনাদায়ক অনুভূতির স্মৃতি তার মনে জেগে

ওঠে। অনুভূতির স্মৃতি সম্পর্কে এটা একটা সহজ উদাহরণ।

তেমনি স্মৃতির নিয়মানুসারে টেলিফোন নম্বরটিও মনে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং আদর্শ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে ভবিষ্যতে একে স্মরণে আনা সম্ভব। এর তার একটা প্রমাণ, এমন অনেক জিনিষই আছে যা আমরা জাগরণে সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় স্মরণে আনতে ব্যর্থ হই। বহু সময়েই তা স্বপ্নে ভেসে ওঠে। এ অভিজ্ঞতা কিছু পরিমাণে সবারই হয়ে থাকবে। এমনি ভাবেই স্বপ্নে আমরা ফিরে পাই বিস্মৃত মনমাতানো কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যকে, নিদ্রার ঘোরে সামনে এসে হাজির হয় হারিয়ে যাওয়া কোনো নাম যে নাম সাধারণ অবস্থায় হয়তো কিছুতেই মনে করতে পারি না, এমনকি নিদ্রাভঙ্গে যাকে আমরা আবার ভুলে যাই। এর দ্বারা এটাই বোঝাতে চাই যে প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ ঘটনাবলী এভাবেই একটা ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষের মনে ছাপ এঁকে দেয় আর সেই ক্যামেরা হচ্ছে আমাদের মস্তিস্ক।

আমি স্মৃতির ব্যাপারে চোখের ভূমিকা সম্পর্কে উদাহরণ দিলাম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবগুলোরই এমন ভূমিকা আছে। সুর-জ্ঞান থাকলে আর কণ্ঠের সহযোগিতা পেলে কোন সুরেলা ধ্বনি শুনে আবার তাকে কণ্ঠে প্রতিফলিত করা যায়। প্রায়ই দেখা যায় যার গানের গলা নেই সুরটি মনে থাকা সত্ত্বেও সে সেটিকে আবার তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। আবার কোনো সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে বহুদিন, বহুমাস এমনকি বহুবছর ধরেও তা করা সম্ভব। তাই দেখা যাচ্ছে কণ্ঠে তাকে উপস্থিত করতে না পারলেও কোন সুরেলা ধ্বনি আমাদের স্মৃতির ঝুলিতে ঠিকই জমা হয়ে থাকে।

স্পর্শানুভূতি দ্বারা কোনো জিনিষকে স্মরণে আনা দর্শন বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত সম্ভব নয়, কারণ তুলনামূলক ভাবে এই ইন্দ্রিয়টি অনেক দুর্বল। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

কোন একটি লোকের সমস্ত জামাকাপড় একটি নিভৃত অন্ধকার কক্ষে রয়েছে। এর থেকে একটা নির্দিষ্ট পোশাক সে বেছে নিতে চায়। সেটা ধরা যাক রেশম, সুতি, পশম ইত্যাদি যে কোন ধরনেরই হতে পারে।

স্পর্শের দ্বারা সে নিশ্চয়ই তার ইপ্সিত পোশাকটিকে বেছে নিতে সক্ষম হবে। স্পর্শানুভূতির দ্বারা কোনো মানুষ একটা জিনিষ থেকে আর একটা জিনিষকে পৃথকীকরণ করতে সমর্থ হয় এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের স্মৃতির কোঠায় স্পর্শের উপযুক্ত আসন আছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের এবং খুবই সহজ। তবে এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বিস্তৃত বিচার করলে দেখা যাবে সামান্য টেলিফোন নম্বর থেকে আরম্ভ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় এভাবেই মানুষের স্মৃতিতে জমা হয়। প্রয়োজনমত তাদের আবার হাজির করাও যায়। মস্তিস্ক হচ্ছে ভালোভাবে সংগঠিত একটি ডাকঘর অথবা ভালো জাতের কোন ব্যবসায়ী যার কাছে যে কোন জিনিষ চাওয়া যাবে সবই সরবরাহ করতে সে সক্ষম। ব্যাপারটাকে আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

১) বাইরের জগত থেকে আমরা আমাদের স্মৃতির বিষয়গুলি আহরণ করি।

২) আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর অতিরিক্ত শ্রান্তি বা অক্ষমতার দরুণ আমরা উপরোক্ত স্মৃতির বিষয়গুলোকে প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে অপারগ হই। কিন্তু এটা সত্যি যে যদি আমরা জানতে পারি কিভাবে বিষয় গুলো আমাদের মনে গ্রথিত হয় তবে নিশ্চয়ই আমরা তাদের স্মরণে আনতে সক্ষম হব।

৩) যে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতের বিষয়গুলো আমাদের স্মৃতির পাতায় নথিভুক্ত হয়, সেই বিষয়গুলোকে ফিরে পেতে হলে উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আবার কাজে লাগাতে হয়।

অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে টেলিফোন নম্বরটি পাওয়া গেল দৃষ্টির দ্বারা, পুনরায় সেই নম্বরটি পেতে হলে ডাইরেক্টরির স্মরণ নিতে হয় অর্থাৎ চোখের সাহায্যেই সেটাকে ফিরে পাওয়া যায়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত কোন সুর-ধ্বনিকে এর দ্বারাই আবার ফিরে

পাওয়া যায়। কারণ কণ্ঠে তাদের তাদের পুনরায় উপস্থিত করলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই একজন পরীক্ষা করে নেবে যে সে যা, শুনেছিল তার সঙ্গে এর মিল আছে কিনা। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূতির স্মৃতি আবার জেগে ওঠে।

৪) আর একটি জটিল ব্যাপার—যে কোন জিনিষ স্মৃতিতে রাখতে হলে সব সময়ই খানিকটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এমন কি এটা বাধ্যতামূলকও বলা যেতে পারে। সিংহের বেলায় শারীরিক যন্ত্রণা প্ররোচকের কাজ করে। সিংহটি মনে রাখে যে সে যন্ত্রণা ভোগ করেছিল এবং এ ব্যাপারটিকে তাই স্মরণ রাখতে সে সমর্থ হয়।

ধরা যাক, নীলাকাশ কাউকে সর্বদাই বিষণ্ণ করে। একজন সঙ্গীতজ্ঞের দখলে আটটি সুর আছে এবং এই সুরগুলি মিলিয়ে সে হাজার সুর তৈরী করে। তার ক্রমাগত প্রচেষ্টা হচ্ছে, একটা সুরের সঙ্গে আর একটি সুরকে মেলানো, আবার সেটির সঙ্গে আরেকটিকে। অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। কোনো অভিনেতার সংস্কার বলবে যে, নীলাকাশ বিষণ্ণতার প্রতীক। কিন্তু কেবল তাই মনে রাখলে ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্মৃতিকে ব্যবহার করলেই চলবে না। বিভিন্নবার ব্যবহারে বিভিন্ন প্রকারের ফলাফল আনতে হবে। যেমন, ওফেলিয়ার চরিত্রকে রূপ দিতে গেলে দেখা যাবে যে অন্য চরিত্রের সঙ্গে তার বিষাদের অনেক পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং কোনো চরিত্রের অনুভূতির বিশেষত্বকে আবেগ ও বুদ্ধি দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে দেখতে হবে যে তা অভিনয়ের চরিত্রের উপযুক্ত হচ্ছে কিনা।

অনুভূতিকে খতিয়ে দেখতে হবে, জানতে হবে তার কার্যকারণ এবং পরে সেই অনুভূতিকে নিজের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজের অনুভূতি-গুলিকে পরীক্ষা করে যেগুলোর সত্যিই গুরুত্ব আছে সেগুলোকে বাছাই করে

আলাদা করতে হবে। প্রত্যেকটি জিনিস লিখে রাখা উচিত। কারণ এতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সুরুচি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা একজনের পক্ষে যে কোনো বিষয়কে করায়ত্ব করা সম্ভব। লিখে রাখলে দিনের পর দিন তার অনুভূতির সঞ্চয় বাড়তে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে অনুভূতির এক দীর্ঘ তালিকা তৈরী হবে। এরপর তালিকার প্রথমটির দিকে তাকিয়ে সে হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করবে—"কেমন করে আমি এই অনুভূতিগুলিকে ফিরিয়ে আনব?" একাকী তাকে অনুভূতির 'কারণ' নিয়ে ভাবতে হবে, নিছক অনুভূতিকে নিয়ে ভাবলে চলবে না।

ধরা যাক, নীলাকাশের কথা ভাবতে গিয়ে সে স্মরণে আনতে পারল যে সে যখন বিষণ্ণ ছিল তখন সে ছিল পাহাড়ের উপরে। এর পরেই হয়তো দেখা যাবে, আর কিছু বোঝার আগেই তার সেই বিষাদ আবার আবির্ভূত হয়েছে। তার এই বিষণ্ণতাকে ধরে রাখতে চেষ্টিত হতে হবে এবং অন্যান্য কাজে জড়িত থাকার সময়েও তাকে সেই অনুভূতিটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। এই গোটা ব্যাপারটায় তাকে ভাবতে হবে যেন সে এভাবে নিজেই নিজের মঞ্চ-পরিচালক। সুতরাং কিছু দিন বাদে সে যখন তার অনুভূতির তালিকায় চোখ বোলাবে এবং চাইবে সেগুলো আবার প্রতিষ্ঠিত করতে। তখন নিজের নির্দেশমত সে প্রশিক্ষণে অংশ নেবে এবং এই মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিদিন কিছু সময় ব্যয় করে সে তার হারিয়ে যাওয়া পুরোনো অনুভূতিগুলোকে আবার ফিরে পেতে কৃতকার্য হবে।

তাকে বুঝতে হবে যে, অনুভূতি সহস্র বর্ণের হতে পারে! ভেবে নিতে হবে যে প্রতিটি অনুভূতিই একটি বিশেষ আবেগ বা বিশেষ অনুভূতি হিসেবে হৃদয়ে গাঁথা থাকে। অত্যন্ত সাধারণ মানসিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়েও ভাবতে হবে যে সেটা কখন এবং কেমন করে ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠিত কোন অনুভূতিকে

ভুলে যাওয়া ও পুনরায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা—এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং ক্রমাগত এভাবে অভ্যাস করতে হবে যতক্ষণ না যে কোনো অনুভূতিকে খুশিমত যে কোনো সময় উপস্থিত করা সম্ভব আর তখনই কেবল একজন নিশ্চিত হতে পারে যে অনুভূতির উপর তার কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

আমেরিকায় শিশিরকুমার-সতুসেন প্রসঙ্গ

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে সতু সেন আমেরিকায় মঞ্চ-স্থাপত্য ও আলোক-প্রয়োগের ক্ষেত্রে রীতিমত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন নাটকের প্রয়োগের বৈচিত্র্য নিয়ে নানা পরীক্ষায় ব্রতী, কলকাতায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়-প্রতিভার সূর্য তখন মধ্য গগনে। সতু সেনের অগ্রজ মনীন্দ্র সেন ছিলেন শিশিরকুমারের বিশেষ পরিচিত। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে অগ্রজের সূত্রেই সতু সেনের সঙ্গে এই যশস্বী নটের পরিচয় হয়েছিল। তখন থেকেই সতু সেন ছিলেন শিশিরকুমারের অভিনয়ের বিশেষ ভক্ত।

বিদেশে এসে বেশ কিছুটা স্থিতি লাভ করার পর সতু সেন তাঁর অন্তরের একটি গভীর বাসনাকে রূপদান করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। সেটি পাশ্চাত্ত্যের রঙ্গমঞ্চে ভারতের নাট্যকুশলীদের দক্ষতাকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। এই সংকল্প তাঁর অন্তরের গভীর জাতীয়তাবোধেরই পরিচয় মাত্র।

সতু সেন রচিত 'আত্মস্মৃতি' অংশে শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আমেরিকায় আনার নেপথ্যকাহিনী বিস্তৃতভাবে কথিত হয়েছে। আমেরিকায় অভিনয় করার ব্যাপারে শিশিরকুমার জনৈক কার্ল রীড-এর সঙ্গে যে চুক্তিনামায়

স্বাক্ষর করেছিলেন, পরবর্তী অধ্যায়ে সেই চুক্তির পূর্ণ বয়ানের অনুবাদ করে দেয়া হল।

শিশিরকুমার তাঁর দলবল নিয়ে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমেরিকায় এসে পৌঁছলেন। জাহাজ-ঘাটায় প্রথমেই তাঁরা যে ব্যক্তির দ্বারা সম্বধিত হয়েছিলেন তিনি সতু সেন। এই নাট্যগোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ছাড়া যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অমলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, কঙ্কা দেবী, প্রভা দেবী, বেলা দেবী ও ঊষা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শিশিরকুমার এসেই তাঁর ম্যানেজার কার্ল রীড-কে জানালেন যে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটার দরুণ তাঁরা তাঁদের দৃশ্যপট ও পোশাকের বাক্সগুলি আনতে পারেন নি, তবে সেগুলি অনতিবিলম্বে এসে যাবে। রীড তার উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে যতদিন ঐ সামগ্রীগুলো আমেরিকায় এসে না পৌঁছচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তিনি শিশিরকুমার ও তাঁর দলের ভরণ-পোষণের খরচ বহন করতে পারবেন না।

এই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন সতু সেন। অশেষ পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত ত্রিশ হাজার ডলারের প্রতিটি কপর্দক তিনি শিশির-কুমার ও তাঁর দলের স্রেফ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যয় করেন। একদল দেশীয় মানুষকে বাঁচানোর জন্য একজন তরুণের এই বিরাট আত্মত্যাগ যে কোন দেশে বা কালে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। শিশিরকুমার ও তাঁর দলের প্রথম মঞ্চাবতরণের সময় আমেরিকার 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, "নিউ ইয়র্কে যে সময় শিশিরকুমার ও তাঁর দলের অভিনয় প্রদর্শনের কথা ছিল, শহরের এক হিন্দুর বাসগৃহে হিন্দুখানা খেয়ে ও জীবনযাপন করে সেই নির্ধারিত সময়ের দুই কি তিন মাস বাদে তাঁরা ভাণ্ডারবিল্ট্ থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেছেন।" উপরোক্ত অংশের বর্ণিত হিন্দুটি সতু সেন।

শিশিরকুমার ও তাঁর দলের প্রথম অভিনয় রজনী নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৯৩০-এর ২৮ অক্টোবর। কিন্তু তখনো অভিনয়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে

জাহাজ আমেরিকায় এসে না পৌঁছানোয় প্রদর্শনী বাতিল করতে হয়। এই ঘটনাকে অবশ্য মার্কিন নাট্য-সমালোচকদের অনেকেই 'বানানো ব্যাপার' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। দলের প্রথম অভিনয়ের পর 'ইভনিং গ্রাফিক' পত্রিকার নাট্য সমালোচক এব্ গ্রাস্নিস তো সরাসরি বলেই ফেললেন, আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব যে দৃশ্যপটের অভাবে এতদিন নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় নি। কয়েকটা ড্র্যাপারি, পেছনের পর্দা ও পাটাতন ছাড়া মঞ্চসজ্জার কাজে কিছুই তো ব্যবহৃত হতে দেখলাম না।

'দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার নাট্য-সমালোচক আরও তীক্ষ্ণ-ভাবে বিদ্রুপ বর্ষণ করেন, "গুজব শুনেছিলাম, মঞ্চসজ্জার উপাদানগুলি অবশেষে এসে পৌঁছেছে। আমার মনে হয়, সেগুলো আবার খোয়া গেছে।"

যা হোক, আমেরিকায় পৌঁছানোর সুদীর্ঘ সাড়ে চার মাস বাদে অবশেষে ইণ্ডিয়া অ্যাকাডেমি অব আমেরিকার ও মারব্যারি-র সৌজন্যে ১৯৩১ সালের ১২ জানুয়ারি শিশিরকুমার ও তাঁর গোষ্ঠী ভাণ্ডারবিল্ট্ থিয়েটারে যোগেশ চৌধুরী প্রণীত 'সীতা' নাটক নিয়ে প্রথমবার মার্কিনী দর্শককুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকদের মধ্যে সেদিন বেশ কিছু ভারতীয় নর-নারীও উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় 'সীতা' নাটকটি সব নিয়ে মোট আটবার অভিনীত হয়েছিল। এর মধ্যে দুবার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। চুক্তিতে উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে কার্যত কেবল 'নাদিরশাহ' নাটকটিই কি মাত্র একবার অভিনীত হয়েছিল? ১৯৩১-এর মার্চ মাসের শেষদিকে শিশিরকুমার তাঁর দলবল নিয়ে স্বদেশাভিমুখে রওনা হন।

'সীতা' অভিনয়ের প্রথম রজনীতে নাটকের চরিত্রগুলি নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত হয়েছিল।

দুর্মুখ	...	অমলেন্দু লাহিড়ী
রাম	..	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
কঞ্চুকী	...	শীতল পাল
বশিষ্ঠ	...	যোগেশ চৌধুরী

লক্ষ্মণ	...	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ঊর্মিলা	...	বেলা দেবী
সীতা	...	প্রভা দেবী
ভরত	...	তারাকুমার ভাদুড়ী
কৌশল্যা	...	ঊষা দেবী
বাল্মীকি	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
লব	...	শৈলেন চৌধুরী
কুশ	...	অরবিন্দ বসু
একটি কণ্ঠস্বর	...	কঙ্কা দেবী

এছাড়া অন্যান্যরা নেমেছিলেন রাজন্যবর্গ, সভাসদ, সাধু, নর্তক-নর্তকী, বিভিন্ন রমণী ও নাগরিকদের গৌণ ভূমিকায়।

'সীতা'র নাট্যাভিনয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকাগুলির মন্তব্যে সমালোচকদের মিশ্র অভিমতের প্রকাশ চোখে পড়ে।

ব্যক্তিগতভাবে কোনো মন্তব্য না করে আমি এখানে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি।

দি নিউ ইয়র্ক সান।

"এক দীর্ঘ-বিলম্বিত প্রদর্শনী গত রাতে ভাণ্ডারবিল্ট্ থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। কলকাতা থেকে আগত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর অভিনেতৃবর্গ 'সীতা' অভিনয় করলেন। এই নাটকটি হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ' থেকে অনুসৃত। যদিও অল্পসংখ্যক পাশ্চাত্ত্যবাসীই মহাকাব্যটির সঙ্গে সুপরিচিত, তবু এ তথ্য প্রমাণিত যে, রাম ও সীতার রোমান্স পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাহিনী। দুর্ভাগ্য, এই মহাকাব্যটিকে ইংরাজী কাব্যে অনুবাদ করার জন্য স্যার এডউইন আর্নল্ড-এর মতো কেউ নেই।

যদিও নাটকটির কোনো ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করা হয়নি, তবু এই অসুবিধে দূরীভূত করার জন্য একজন ব্যক্তি (নিঃসংশয়ে শ্রীভাদুড়ীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর) প্রতিটি অংক শুরু হওয়ার পূর্বে পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে পরবর্তী কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ইংরাজীতে তুলে ধরছিলেন।

……হিন্দু অভিনেতৃবর্গ চমৎকার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন। একমাত্র মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ ব্যতীত, এবং যাঁদের আমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কুশীলব বলে মনে করি, এঁদের অভিনয় যে কোনো বিদেশী দলের অভিনয়ের তুল্য। হিন্দু অভিনেতৃবৃন্দের চলাফেরা এত সৌন্দর্য-মণ্ডিত যে তাঁদের অঙ্গভঙ্গি কখনো দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে না। তাঁদের উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং সাবলীল ; একজন দর্শক তাঁদের ভাষা না বুঝেও এটা অনুভব করতে পারেন। এবং নাটকের তারকা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী একজন প্রগাঢ় শক্তিসম্পন্ন আবেগদীপ্ত অভিনেতা।

যদিও নাটকটি 'গ্র্যাণ্ড ষ্টাইল'-এ রচিত, তবু অভিনেতৃবৃন্দ অতি-অভিনয় করার প্রলোভন দমন করেছেন।

……পাশ্চমী অভিনয়রীতির সঙ্গে এঁদের অভিনয়ের পার্থক্য কখনো কখনো ধরা পড়ে। আলোকসম্পাত, সঙ্গীত পরিবেশন এবং মঞ্চসজ্জা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তবু এসব কার্যকর হয়েছে। নাট্যামোদীরা যদি এমন নাটক দেখতে চান, যা তাঁদের ব্রডওয়ের সীমা থেকে বহু দূরে নিয়ে যাবে, তাহলে এই হল তাঁদের সুযোগ।"

নিউইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট ১৩. ১. ৩১.

"হিন্দু অভিনেতৃবর্গের যে দলটি গত অক্টোবরে এ দেশে এসেছেন, কার্ল রীড ও এলিজাবেথ মারবারি-র সহায়তায় তাঁরা অবশেষে গত রাত্রে ব্রডওয়ের ভাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে পবিত্র হিন্দু মহাকাব্য 'রামায়ণ' অনুসৃত 'সীতা' নাটক অভিনয় করলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা হচ্ছেন শ্রীমতী মারবারি-র সহযোগিতায় ইণ্ডিয়া অ্যাকাডেমি অব আমেরিকা।

অভিনেতা-ব্যবস্থাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে কলকাতার এই কথিত জনপ্রিয় দলটি ব্রডওয়েতে তাদের অভিনয়ের নমুনা দেখানোর সুযোগ পাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষায় ছিলেন। স্বল্পসংখ্যক কিন্তু বন্ধুমনোভাবাপন্ন কিছু দর্শক কাল রাতে নাটকটি দেখতে সমবেত হয়েছিলেন। এটি প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল ২৮ অক্টোবর, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এর কারণ

হিসেবে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু দৃশ্যপট ভারতে ফেলে আসা হয়েছিল।"

......"ভারতীয় নাট্যমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর দলের কতটুকু মর্যাদা তা আমরা জানি না। শিশিরকুমার ও তাঁর দলের কয়েকজনের গলার স্বর সুমিষ্ট ও তরঙ্গায়িত। কিন্তু যাঁরা তাঁদের ভাষা বোঝেন না তাঁদের কাছে এ অভিনয় একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। এই একঘেয়েমি দূর করার উপযুক্ত আলোকসম্পাত বা গতিময়তা প্রদর্শনীটিতে ছিল না।

সুতরাং প্রথম দেখার চমক নিভে গেলে অভিনেতৃবর্গের দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদের কাছে 'সীতা' একটি যন্ত্রণাদায়ক সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে। গত রাত্রের দর্শকদের মধ্যে সংলাপ-অনুধাবনকারী কিছু হিন্দুদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা অভিনয় উপভোগ করছেন।"

নিউইয়র্ক টাইমস

"......সাধারণ দর্শকের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরের কোনো জিনিসকে উপলব্ধি করার দুস্তর সমস্যাটিই আবার এ ক্ষেত্রে ('সীতা' অভিনয়ে) পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভাষা এখানে এক প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলেছে। গত শীতে মেই ল্যান ফ্যাঙ তাঁর ভঙ্গিমামণ্ডিত ঐতিহ্যশীল শিল্প-আঙ্গিকের অভিনয় পরিবেশনের মধ্য দিয়ে যেমন আনন্দসঞ্চার করেছিলেন, তেমন কোনো উপাদানই এখানে নেই।......তারকারূপে চিহ্নিত মুখ্য অভিনেতার অভিনয় এত বেশি সোচ্চার ও বাহুল্যময়, যা একালের মার্কিনী দর্শকরা আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন না।"

'সীতা' নাট্যাভিনয়ের প্রশংসায় সবচেয়ে সবাক হয়েছিলেন 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিব্যুন'-এর নাট্য সমালোচক। লিবারেল দলের এই দৈনিকটিতে 'ভাদুড়ী ট্রুপারস্ এনথ্রল অডিয়েন্স ইন হিন্দু প্লে সীতা' এই শিরোনামে যে সুদীর্ঘ সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়, তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে মূল ভাষাতেই উদ্ধার করা হচ্ছে।

"Novelty came to the current theatrical season at the Venderbilt Theatre last night in perhaps the most ancient play that has ever been shown on Broadway.

......This is so far as known, the first time a complete company of Hindu players has appeared on Bombay. The actors plan a season of repertory and will draw up their stock of more than 20 plays.

Besides the star their are two other members of the family in the cast—Biswanath Bhaduri and Tarakumar Bhaduri—his brother placing the family on a level with the Barrymores and the Nugents in numbers at least.

There are five dancers who participate in the court scene of the play. Mr. Ziegfeld and Mr. Carroll "ain't seen nothing yet" in beauty if they haven't seen these nautch girls. Handsome of face, graceful of form, lilthe and supple of movement, they would grace and "glorifying" attraction at $ 5.50 a sent."

অপরিচিত ভাষা নিয়ে যে অসুবিধে ও সমস্যার কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ট্রিব্যুন'-এর সমালোচক বলেছেন,

"This company of Hindu Actors, speaking in a language so distinctly foreign to American ears, succeeded in vitalizing this story to such an extent that scarcely a person left before The curtain. After all, beauty and anguish know no tongue."

শিশিরকুমার ও তাঁর দলের প্রত্যেকের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলা হয়েছে ঃ

"Even the meanest player last night can boast of an annunciation and an intonation far excelling that of most American stars......Sisirkumar Bhaduri is an actor of the finest rank. Last night play kept him in two contrasting moods lyric and emotional. He seemed to excel in the latter,

investing some of his scenes that strongly moved his audience."

'ট্রিব্যুন'-এ মহিলা-শিল্পীদের অভিনয়ের বিশেষ উল্লেখ করা হয় এবং সীতার রূপিণী প্রভা দেবীকে উঁচুজাতের অভিনেত্রী বলে সম্বোধন করা হয়।

'নিউইয়র্ক টেলিগ্রাম' পত্রিকায় বেশ একটি আকর্ষণীয় শিরোনামা দিয়ে নাট্যাভিনয়ের ওপর আলোচনা হয়, 'ইণ্ডিয়ান গ্রেট অডিসি ফ্যাসিনেটিং অ্যাণ্ড উইয়ার্ড।' বেশ একটু চাতুর্য অবলম্বন করেই উক্ত পত্রিকার আলোচক মন্তব্য করেছিলেন যে, নাটকটি যতখানি না আনন্দজনক তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ। 'দি ইভনিং ওয়ার্লড্' এবং 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় শিশিরকুমারকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে আখ্যা দান করা হয়।

নবীন উন্মাদনা ও নানা অভিনব নিরীক্ষার উত্তাল জোয়ারে ব্রডওয়ে তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ধ্রুপদী ও মন্থর মেজাজের নাটক সম্পর্কে নতুন দর্শককুলের মধ্যে অনীহা জেগে উঠছে এবং কখনো কখনো তা চরম ঔদাসীন্যে রূপ নিচ্ছে। শিশিরকুমার ও তাঁর দলের ব্যবসায়িক ব্যর্থতা প্রধানত এই ঔদাসীন্যেরই শিকার হয়েছিল। তার ওপর রক্ষণশীল মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল পরম ভারত-বিদ্বেষী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এই সব কাগজে কঠোর মনোভাব রক্ষা করা হত। এই পত্রিকাগুলি বহুসময়েই রীতিমত পরিকল্পিতভাবে সফররত নাট্যগোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছে। সতু সেন এই সময় কলকাতায় তাঁর জনৈক বন্ধুকে লেখেন, "শিশিরকুমার যদি নাটকের পরিচালনায় ও উপস্থাপনায় মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের বদলে চটুলতা ও স্থানে স্থানে গ্রাম্য রসিকতার আমদানি করতেন, মার্কিনি দর্শককুল তাহলেই বোধ হয় বেশি খুশি হতেন। মাঝে মাঝে সংলাপাংশ কেটে বেশ একটু চড়া সুরের গান-বাজনা আমদানি করা হলে তো তাঁদের আনন্দের সীমা থাকত না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য শিশিরকুমার সে জাতীয় কোন আপসের মধ্যে যাননি! তিনি আমাদের জাতীয় সম্ভ্রমকে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কঠোরভাবে রক্ষা করেছিলেন

শিশিরকুমারের দলের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণগুলি সততার খাতিরে তুলে ধরা উচিত। যে নৃত্য-শিল্পীদের সৌন্দর্য ও গতিভঙ্গিমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 'হেরাল্ড ট্রিব্যুন'-এ করা হয়েছিল, তাঁরা আদৌ ভারতীয় নন। জানা গেছে যে কিছু কালো চুল ও চোখ-অলা স্পেনিস নর্তকীকে মঞ্চে উপস্থিত করা হয়। এই তথ্য যখন বাইরে জানাজানি হয়ে যায়, তখন শিশিরকুমারকে রীতিমত অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ভারত থেকে যে পোশাক ও দৃশ্যপট আনা হয়েছিল, তা আশানুরূপ ছিল না। 'সীতা' নাটকের ইংরাজি ভাষায় অভিনয়ের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। দলের মার্কিন সফরের মাঝামাঝি সময় থেকেই অবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সে সম্পর্কে কিছু তথ্য স্বয়ং সতু সেনের মুখ থেকেই শোনা যাক।

"সুনাম ও মানহানির আশঙ্কায় শিশির-গোষ্ঠীর আমেরিকায় আগমনের কিছুদিন পরই কার্ল রীড চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষমতা জানান। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রদর্শনীগুলি একটির পর একটি বাতিল হয়ে যেতে থাকে।···দল সম্পর্কে তাঁর (শ্রীমতী মারবারি) কানে এত বিরূপ মন্তব্য এসে পৌঁছেছিল, যার ফলে তাঁদের একটি নাটকও তিনি দেখেননি। সর্বোপরি, তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন···। তিনি এতদূর রুষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁর কাছে আমি যে সৌজন্য প্রবেশপত্রগুলি পাঠাতাম, সেগুলি তিনি অন্যদের বিলিয়ে দিতেন এবং অভিনয়ান্তে তাঁদের বিরূপ মন্তব্যের সারাংশ আমাকে পত্রদ্বারা জানিয়ে দিতেন।

শ্রীমতী মারবারি হাত ধুয়ে ফেললেন, কার্ল রীড চুক্তিপত্র ছিঁড়ে দায়িত্বমুক্ত হলেন, এরিক এলিয়ট উদাসীন হয়ে গেলেন। ফলে শিশিরকুমার ও তাঁর দলের অভিনয়ের ব্যবস্থা, ভরণ-পোষণ ও দেশে ফেরার প্রশ্নের সব ভার আমার ওপর চাপল। আমার একটা নৈতিক দায়িত্বও এ-ব্যাপারে ছিল, কারণ আগাগোড়া এই সফর ফলপ্রসূ হওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘকাল আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলাম।"

সেই সময় থেকেই সতু সেন নিজের কাজে ইস্তফা দিয়ে সময়ের সবটুকু

দলের পিছনে ব্যয় করেছিলেন। এই গাফিলতির জন্য ল্যাবরেটরি থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা হোক, এক ধনী বন্ধুর সহায়তায় সতু সেন বহুকষ্টে শিশির-গোষ্ঠীকে জাহাজযোগে ১৯৩১-এর মার্চ মাসে ভারতে পাঠাতে সক্ষম হন। প্রভা দেবী এই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং জাহাজ-কোম্পানি কিছুতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায়নি। বহু কষ্টে তাদের রাজি করাতে হয়েছিল।

একটি ঐতিহাসিক চুক্তিপত্রের মূল বয়ান

২৩৪ ওয়েস্ট ফরটি ফোর্থ স্ট্রীট, মানহাট্টান, নিউইয়র্কে দপ্তররক্ষক কার্ল রীড এবং ভারতবর্ষের কলকাতা শহর নিবাসী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মধ্যে এই চুক্তিপত্র সম্বাক্ষরিত হল। নিম্নোক্ত অংশে উভয়কে যথাক্রমে 'ম্যানেজার' ও 'শিল্পী' বলে উল্লেখ করা হবে।

সাক্ষীর বক্তব্য

যেহেতু, কয়েকটি মৌলিক হিন্দু নাটকের ওপর শিল্পীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে এবং ভারত সাম্রাজ্যে বহু বছর যাবৎ তিনি ঐ সব নাটক উপস্থাপনা ও পরিচালনা করছেন, এবং যেহেতু তাঁর ব্যবস্থাপনায়, নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় হিন্দু অভিনেতারা স্বয়ং শিল্পীসহ ঐ প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ করছেন, সুতরাং উক্ত শিল্পী ভারতবর্ষে সম্ভ্রম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, এবং

যেহেতু, ম্যানেজার বহু বছর যাবৎ ব্রডওয়ে নাট্যমঞ্চে বহু নাটক প্রযোজনা করে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সততা ও যোগ্যতা অর্জন করেছেন ; এবং

যেহেতু, শিল্পী ম্যানেজারের ব্যবস্থাপনার অধীন থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ডমিনিয়ন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে (এশিয়া মহাদেশ ছাড়া) হিন্দু জীবন, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে হিন্দু অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনীত নাটক উপস্থাপনা ও পরিচালনা করতে সম্মত এবং ম্যানেজারও বর্ণিত ভূখণ্ড-গুলিতে শিল্পী ও তাঁর দলের অভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে রাজি ; এবং

যেহেতু, কথিত শিল্পী-বর্ণিত ভূখণ্ডগুলিতে উক্ত নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করার সর্বপ্রকারের অধিকার নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে ম্যানেজারের হাতে অর্পণ করতে সম্মত এবং শিল্পী ও পরিচালকরূপে সন্তোষবিধানের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত,

সুতরাং, শিল্পী ও ম্যানেজার নিম্নোক্ত ধারাগুলির ভিত্তিতে এই চুক্তিনামায় সম্বাক্ষরবদ্ধ হচ্ছেন।

১। যে কোনো চেহারায় নিম্নবর্ণিত নাটকগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র,

ক্যানাডা ডমিনিয়ন এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানে (এশিয়া মহাদেশ বাদে) প্রদর্শন করার বিষয়ে শিল্পী ম্যানেজারকে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রদান করছেন।

নাটকগুলির নাম

১। সীতা	২। নাদিরশাহ	৩। শকুন্তলা
৪। শাহজাহান	৫। রমা	৬। পাষাণী

২। ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর দল সমেত মোট বাইশ জনের কলকাতা, ভারতবর্ষ থেকে নিউইয়র্ক শহর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত আগমনের খরচ বহন করতে সম্মত। ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর স্ত্রী-র জন্য প্রথম শ্রেণী এবং দলের অন্যান্যদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ-ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন। দলটি যাতে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এর মধ্যে আমেরিকায় পৌঁছয় তার জন্য শিল্পী অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন। ১ সেপ্টেম্বর বা তার পূর্বে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াতকারী কোনো খ্যাতনামা জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস না পেলে শিল্পী অবশ্য এই অঙ্গীকার রক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন না।

৩। ম্যানেজার শিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনয়ে অংশ গ্রহণের জন্য ও দলগত অভিনয় পরিচালনার জন্য সপ্তাহের প্রতি শনিবার ৩২৯০ ডলার দিতে বাধ্য থাকবেন। এক সপ্তাহে আটটি নাট্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে হবে; যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছাড়া যদি আগন্তুক দল সপ্তাহে আটটির অনধিক অভিনয়-প্রদর্শন করে, তবে আনুপাতিক হারে সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের ধার্য অংশ থেকে টাকা কাটা যাবে।

৪। শিল্পী বা তাঁর দলের কোনো বিশিষ্ট সদস্য যদি একান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়েন তবে তাঁদের আমেরিকায় আগমনের দুই সপ্তাহের মধ্যে ম্যানেজার নিউইয়র্কের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর মঞ্চগুলির যে কোনটিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবেন।

৫। শিল্পীর লিখিত অনুমতি ছাড়া ম্যানেজার কোনো নাটকের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করতে পারবেন না। শিল্পী তাঁর ও তাঁর দলের পক্ষ থেকে এই সর্তে সম্মত থাকবেন যে মহড়ার সময়ে কোনো অতিরিক্ত অর্থ তিনি পাবেন না। নিউইয়র্কে আসার দু' সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম অভিনয় রজনীর পূর্বেই মহড়া সমাপ্ত করতে হবে।

৬। পূর্বাহ্নেই ম্যানেজার ও শিল্পী কর্তৃক স্বীকার করা হচ্ছে যে, উভয় পক্ষ লিখিত ও স্বাক্ষরিত ভাবে না জানালে এই চুক্তির কোনো ধারার পরিবর্তন বৈধ বলে গণ্য হবে না।

৭। শিল্পী নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে পূর্বর্বর্ণিত নাটকগুলি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে তাঁর আইনগত পূর্ণ অধিকার আছে।

৮। শিল্পী তাঁর ও তাঁর দলের তরফ থেকে দ্রুত মহড়া সম্পন্ন করা, রূপসজ্জা ও পোশাক সম্পর্কে কড়া নজর রাখা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা, সমস্ত নিয়ম ও আইন মেনে চলা, একমাত্র ম্যানেজারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, সহযোগী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ না করার বিষয়ে সম্মতি জানাচ্ছেন।

৯। ম্যানেজার ও শিল্পী—উভয়ের সম্মতিক্রমে স্থির করা হল যে চুক্তিপর্ব সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার উক্ত নাটকগুলির সমস্ত পাণ্ডুলিপি (যাবতীয় পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্জিত অংশ সহ) শিল্পী ও তাঁর দলের অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তি শিল্পীকে ফেরৎ দেবেন।

১০। পেশাদার নাট্যাভিনয়ে যাকে বলে 'তারকা', একমাত্র শিল্পীর নামের সঙ্গে ঐ বিশেষণ ম্যানেজার ব্যবহার করতে পারবেন যদি না শিল্পী লিখিতভাবে তাঁর দলের অপর কারও নামের সঙ্গে বিশেষণটি ব্যবহারের অনুমতি না দেন। যে কোনা নাট্যশালাতেই শিল্পী ও তাঁর দলের অভিনয় প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করা হোক না কেন, শিল্পীকেই তাঁর নিজস্ব সাজঘর বেছে নেওয়ার প্রথম সুযোগ দিতে হবে।

১১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল বা ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, যে কোনো জায়গাতেই শিল্পী তাঁর দলসমেত অভিনয় প্রদর্শনের জন্য যান না কেন, ম্যানেজারকে শিল্পী ও তাঁর দলের যাতায়াত, রাহাখরচ এবং মালপত্র বহন করার ভাড়া যোগাতে হবে। যাতায়াতের সময় শিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর জন্য পার্লার কার ও নিদ্রার বন্দোবস্ত যুক্ত প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টের ব্যবস্থা ম্যানেজারকে করতে হবে। দলের অন্যান্যদের অনুরূপ গাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১২। শিল্পী নির্দিষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে তাঁর ও তাঁর দল কর্তৃক অভিনীত নাটকগুলি মৌলিক, অনন্যসাধারণ ও বিশিষ্ট চরিত্রমণ্ডিত হবে, দাতব্যের খাতিরেই হোক বা অর্থাগমের জন্যই হোক, শিল্পী ও তাঁর দল চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন ম্যানেজারের লিখিত অনুমতি ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, সহযোগী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না।

১৩। পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে স্বীকৃত হল যে, আগুন, দুর্ঘটনা, ধর্মঘট, দাঙ্গা, ঐশ্বরিক কারণে দুর্যোগ, জন-সন্ত্রাস বা অন্যান্য যে কোনো অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য কারণে যদি প্রদর্শনী স্থগিত থাকে, তবে তার জন্য ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর দলকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না। শিল্পী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও একমাসব্যাপী অসুস্থ থাকেন এবং এই কারণে মঞ্চাবতরণে ব্যর্থ হন তবে ম্যানেজারের চুক্তিনামা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিল্পী ও তাঁর দলবলকে সাজ-সরঞ্জাম সহ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠানোর ব্যয় ম্যানেজারকে বহন করতে হবে।

১৪। সামগ্রিকভাবে এই চুক্তি, চুক্তিটির কোনো কোনো ধারা বা যে কোনো ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে যদি শিল্পী ও ম্যানেজারের মধ্যে কোনো বিরোধ বা মতদ্বৈধতার উদ্ভব হয় তবে তা আমেরিকান আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশন নির্ধারিত সালিশি সংক্রান্ত আইনকানুনের মাধ্যমে বিচার্য হবে।

যিনি সালিশির জন্য দাবি জানাবেন, তাঁকে অপরজনকে লিখিতভাবে তাঁর দাবি গোচরীভূত করতে হবে। যা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হচ্ছে, তাঁর বাসগৃহ বা কর্মস্থলের ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি ডাকে অভিযোগ পাঠাতে হবে এবং অভিযোক্তাকে পত্র-প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তিনজন সালিশিকার অভিযোগের তদন্ত করবেন। এঁদের মধ্যে একজন হবেন ম্যানেজার কর্তৃক অপরজন শিল্পী কর্তৃক মনোনীত। এই দুইজন সালিশিকারের পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী তৃতীয়জনকে মনোনীত করা হবে এবং এই মনোনয়ন আমেরিকান আরবিট্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই চুক্তিপত্রের প্রতিটি ধারা ব্যাখ্যাত হবে।

১৫। ১৯৩০-৩১ সালের নাটক অভিনয়ের মরসুম অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ থেকে ৩১ আগষ্ট, ১৯৩১ পর্যন্ত শিল্পী ও ম্যানেজারের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। অন্যূনপক্ষে চার সপ্তাহের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর দলের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ম্যানেজার যদি চুক্তিবর্ণিত ধারাগুলিকে সফলভাবে কার্যকর করতে পারেন এবং শিল্পী ও তাঁর দলের অভিনয় যদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আর্থিকভাবে সফল হয়, তবে পরবর্তী নাট্য-মরসুমগুলির জন্য চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর অধিকার শিল্পী ইচ্ছা করলে ঐ ম্যানেজারকে দান করতে পারেন। এই বর্ধিত মেয়াদের কাল হবে ১৯৩১-৩২, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪ এবং ১৯৩৪-৩৫। প্রতিটি মরসুম সমাপ্ত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যেই চুক্তির পুনর্নবীকরণ করতে হবে। নাট্যাভিনয়, চলচ্চিত্রাভিনয় বা অন্য যে কোন ধরনের প্রদর্শনী এই বর্ধিত চুক্তির এক্তিয়ারভুক্ত হবে। নিম্নোক্ত ঘোষণা মারফত ম্যানেজারকে চুক্তিনামার মেয়াদ বাড়ানোর কথা শিল্পীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১৯৩১-৩২-এর নাট্য-মরসুমে ম্যানেজার শিল্পী ও তাঁর দলকে এই

চুক্তিনামা বর্ণিত ধারাগুলি অনুযায়ী ন্যূনতম আট সপ্তাহব্যাপী কাজ ও প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ৪৩০০ ডলার পারিশ্রমিক দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

১৯৩২-৩৩ এর মরসুমে ন্যূনতম কাজের মেয়াদ হবে বারো সপ্তাহ এবং পারিশ্রমিক হবে ন্যূনতম সপ্তাহপিছু ৫০০০ ডলার।

১৯৩৩-৩৪ এর মরসুমে ন্যূনতম কাজের মেয়াদ ও ন্যূনতম সাপ্তাহিক পারিশ্রমিকের হার হবে যথাক্রমে পনেরো সপ্তাহ এবং ৬০০০ ডলার।

১৯৩৪-৩৫ মরসুমে ন্যূনতম কাজের মেয়াদ ও ন্যূনতম সাপ্তাহিক পারি-শ্রমিকের হার হবে যথাক্রমে পনেরো সপ্তাহ এবং ৭০০০ ডলার।

এই নোটিশ সরাসরি শিল্পীর হাতে দেওয়া যাবে অথবা শিল-মোহরাঙ্কিত, উত্তরের ডাক-মাশুল প্রদত্ত খামে একটি চুক্তিকাল সমাপ্ত হওয়ার ত্রিশদিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত তত্ত্বাবধানের অধীন যে কোনো ডাকঘরে জমা দিতে হবে।

১৬। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বীকার করা হচ্ছে যে, ম্যানেজারের লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে শিল্পী ও তাঁর দলের অভিনীত নাটকগুলি যদি চলচ্চিত্র, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ, বেতার, ফোটোগ্রাফ, রেকর্ড বা অন্য কোনো মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ম্যানেজার ও শিল্পী অর্জিত অর্থ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নেবেন।

১৭। এক সপ্তাহের প্রদর্শনীতে যদি ৫০০০ ডলারের কম আয় হয়, তবে ম্যানেজার শিল্পীকে লভ্য অর্থের ৫% দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন। আর যদি ৫০০০ থেকে ৭৫০০ ডলার হয় তবে ম্যানেজারের দেয় হবে ৭½% এবং আয়ের অঙ্ক ৭৫০০ ডলার অতিক্রম করলে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১০% অঙ্কে।

১৮। যে ম্যানেজারের সঙ্গে শিল্পী এই চুক্তিনামাটি স্বাক্ষর করছেন,

পরবর্তীকালে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো বা ওই একই ম্যানেজারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।

১৯। শিল্পী ভারতবর্ষ থেকে নাট্যাভিনয়ের পক্ষে উপযোগী সাজসজ্জা, গহনা, দৃশ্যপট ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসবেন এবং এগুলি বহনের জন্য যত অর্থই ব্যয়িত হোক তা ম্যানেজারকে বহন করতে হবে। প্রথম ধারায় বর্ণিত নাটকগুলির অভিনয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামগুলি সম্পর্কেই কেবল এই নীতি প্রযুক্ত হবে। এই সব জিনিসপত্র দিয়েই যতদূর সম্ভব প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ম্যানেজার ও শিল্পীকে করতে হবে। এরিক এলিয়টের অভিমত অনুসারে, এখানে সে সব প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরি করে নিতে হবে, যেগুলি নির্মাণ করার খরচ সেগুলিকে ভারতবর্ষ থেকে বহন করার খরচের থেকে কম পড়ে। শিল্পী প্রদর্শনীর জন্য যে সব বস্তুসামগ্রী নিয়ে আসবেন, যত খরচই পড়ুক না কেন, আমেরিকা থেকে ভারতে সেগুলিকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ম্যানেজারকে বহন করতে হবে।

২০। ম্যানেজারের লিখিত অনুমতিক্রমে ১৬ নং ধারায় বর্ণিত এই চুক্তিনামার বহির্ভূত যে সব প্রদর্শনীতে শিল্পী ও তাঁর দল অংশগ্রহণ করতে পারবেন, সে সব ক্ষেত্রে অভিনেতৃবর্গের সংখ্যা কোনো অবস্থাতেই আটজনের বেশি হবে না।

আমেরিকায় থাকাকালীন নৈশভোজে বা অন্যত্র বক্তৃতার জন্য এবং রচনা প্রকাশের জন্য শিল্পী যে অর্থ উপার্জন করবেন, তার অর্ধেক ম্যানেজারের প্রাপ্য।

২১। শিল্পীকে নিজের ও তাঁর দলের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, কোন সময়েই তাঁরা বৃটিশ সরকার বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন— যে কোনো একটির রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারবেন না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নিয়ে এখানে বিতণ্ডার উদ্ভব

হয়, বক্তৃতায় বা আচরণে সে জাতীয় ভাব প্রকাশ থেকে শিল্পী ও তাঁর দলের প্রতিটি সদস্যকে বিরত থাকতে হবে। তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক।

২২। চুক্তিবদ্ধ দুইজনেব পারস্পরিক লিখিত সম্মতি ছাড়া এই দলিলের কোনো ধারা কার্যকর না করার অধিকার কারোরই থাকবে না।

২৩। চুক্তিনামাটির দুটি কপি করতে হবে এবং প্রত্যেক চুক্তিকারী এক কপি মূল দলিল পাবেন।

২৪। এই দলিল সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য শিল্পী ম্যানেজারকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় হাতে বা ডাক মারফৎ পত্র প্রেরণ করবেন :

শ্রী কার্ল রীড
২৩৪, ওয়েস্ট ফর্টি ফোর্থ স্ট্রীট,
বরো অব মানহাট্টান,
সিটি অব্ নিউ ইয়র্ক,
ইউ এস এ

একই ভাবে ম্যানেজার দলিল সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য শিল্পীকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় হাতে বা ডাক মারফৎ চিঠি পাঠাবেন।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
অবধায়ক : লিউইস এম গ্রীন এস্কোয়ার,
২৫, ওয়েস্ট ফর্টি থার্ড স্ট্রীট,
বরো অব মানহাট্টান,
সিটি অব্ নিউইয়র্ক,
ইউ এস এ,

২৫। শিল্পী ও তাঁর দল এদেশে পদার্পণ করার চার সপ্তাহের মধ্যে যদি অভিনয় প্রদর্শন না করেন, এবং অপারগতা যদি শিল্পী বা ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত না হয়, এবং তা শিল্পী ও তাঁর দলের পরিকল্পিত ও স্বেচ্ছাকৃত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐ সময় উত্তীর্ণ হওয়ামাত্র ভারতাভিমুখী প্রথম জাহাজটিতে চড়েই শিল্পী ও তাঁর দলটিকে দেশে রওনা দিতে হবে। ব্যক্তিগত প্রয়াসে বা অন্য কারও ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁরা এ দেশে কোনো অভিনয় প্রদর্শন করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ম্যানেজারও আর শিল্পী, তাঁর দল ও ভারতবর্ষ থেকে আনীত সাজ-সরঞ্জামগুলির প্রত্যাবর্তনের ভাড়া দিতে বাধ্য থাকবেন না। চুক্তিভঙ্গ করার দরুণ শিল্পীকে তাঁর ও তাঁর দলের ও তাঁর আনীত সাজ-সরঞ্জামের আনয়ণের ব্যয় ম্যানেজারকে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

২৬। যেহেতু এই দলিলটির চরিত্র অ-সাধারণ এবং বিচিত্র, তাই পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ম্যানেজার দলিলের সবকটি ধারা মেনে চলা সম্পর্কে শিল্পীর কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তিনামাটি কার্যকর বলে গণ্য হবে না। কিন্তু শিল্পীর অনুমতি ছাড়াই চুক্তিটিকে অর্থনীতিকভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য ম্যানেজার তাঁর ব্যয়ভার সংগ্রহ করার জন্য নিজস্ব অর্থকরী স্বার্থ অন্য কারও কাছে বিক্রয় করতে বা গচ্ছিত রাখতে পারবেন।

২৭। পারস্পারিকভাবে অনুভূত ও স্থিরীকৃত হয়েছে যে এখানে যে সব নাটকের অভিনয় হবে, সেগুলি গানগুলি সমেত পূর্ণত বা অংশত মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে বা অন্যভাবে যে পদ্ধতিতেই উপস্থাপিত হোক না কেন, ম্যানেজারের অধিকার থাকবে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে হিন্দি বা ইংরিজী ভাষায় পরিবেশন করার।

২৮। শিল্পী ও তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে দলের অন্যান্যদের উপযুক্ত খাওয়া থাকা বাবদ প্রতিটি সদস্য বা সদস্য পিছু ম্যানেজার কোনো অবস্থাতেই সপ্তাহে ২৫ ডলারের বেশি ব্যয় করবেন না। এই কাজের জন্য ম্যানেজার এমন

একজন হিন্দু সহযোগীকে সংগ্রহ করে নেবেন, যিনি একই সঙ্গে ভারতীয় জনগণ ও আমেরিকার জনগণের স্ব স্ব দেশীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দলের সফরকালীন বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কাজে এই সহযোগী ম্যানেজারকে পথ দেখাবেন ও উপদেশ দেবেন।

২৯। যেহেতু ম্যানেজার দলিলটিকে কার্যকর করার জন্য এটি শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এরিক এলিয়টের হাতে অর্পণ করবেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি দলিলটি বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারতবর্ষে শিল্পীর কাছে যাবেন, সুতরাং ঐ একই পদ্ধতিতে দলিলটি প্রত্যর্পিত হওয়া ও ম্যানেজার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ চুক্তিনামা হিসেবে পরিগণিত হবে না।

নিরাপদভাবে খামে পুরে, ঠিকমত ডাকটিকিট লাগিয়ে, পূর্ব বর্ণিত ঠিকানায় ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বহনকারী ডাকযোগে দলিলটি ম্যানেজারের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

শিল্পী যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণের পর চুক্তিপত্রে তাঁর স্বাক্ষর সনাক্ত করবেন এবং তা করা হবে নিউইয়র্ক রাজ্য ও কাউন্টির একজন নোটারি পাবলিকের সমক্ষে।

৩০। ১৮ ও ২০ নং ধারায় 'সব রকমের রচনা' বা রচনাবলী বলতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে কেবল সাময়িকী এবং সংবাদপত্র লিখিত প্রবন্ধ ও রচনাগুলি পড়ে। কিন্তু উপন্যাস বা গ্রন্থরচনা উক্ত ধারাগুলির অঙ্গীভূত নয়। নাটকগুলিকে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসাকারে রূপ দিলে সেই রূপকৃতি উক্ত ধারাগুলির আওতায় পড়বে।

এই দলিলটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে শিল্পী প্রথমে ম্যানেজারকে এই অধিকারদান করছেন যে চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন শিল্পী যদি কোনো নাটক রচনা বা প্রযোজনা করেন তবে সেই নাটক বা নাটকগুলি উপস্থাপন করতে ম্যানেজার অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন অথবা এই চুক্তিনামার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী সেই নাটক বা নাটকগুলির উপস্থাপন করতে পারবেন।

৩১। এই চুক্তিপত্র উভয় পার্টি, তাঁদের এক্সিকিউটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর,

ব্যক্তিগত প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী এবং সংযুক্ত অন্যান্যদের উপর বাধ্যতা-মূলক।

সাক্ষীর সমক্ষে উভয় পার্টি তাঁদের পরস্পরের হাত মেলাচ্ছেন এবং পূর্ব উল্লিখিত দিন ও বৎসরে চুক্তিটিতে স্বাক্ষরদান করছেন।

এই হল মূল দলিলটির সম্পূর্ণ বয়ান। ম্যানেজার কার্ল রীড ও শিশির কুমার ভাদুড়ী নোটারি পাবলিক এইচ জে. ফ্যারেলের সমর্থনপুষ্ট এই দলিল-টিতে স্বাক্ষর করেন। অন্যান্য যাঁদের স্বাক্ষর চুক্তিনামাটিতে আছে তাঁরা হলেন ইরা এ. ক্যাম্বল, লিউইস এম. গ্রীন এবং শিশিরকুমারের পক্ষে বি. কে. বসু।

সতুসেন পরিচালিত ও শিল্পনির্দেশিত নাটক ও চলচ্চিত্রের তালিকা

আমেরিকায় অবস্থান কালে সতুসেন চল্লিশেরও বেশি নাটকে নকশ্যাবিদ, সহকারী প্রয়োগ নির্দেশক, প্রয়োগপ্রধান, সহকারী পরিচালক ও পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে তাঁর কি ভূমিকা ছিল দেওয়া হল।

থি্ সিষ্টার্স	(প্রয়োগপ্রধান)
আঙ্কল ভানিয়া	(ঐ)
রেসারেকশন	(ঐ)
ওয়ার এ্যাণ্ড পীস	(ঐ)
ব্লু বার্ড	(ঐ)
মিড সামার নাইটস ড্রিম	(ঐ)
দি সালকি ফায়ার	(ঐ)
মার্কোস মিলিয়নস	(মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত)
লাইট অব এশিয়া	(যুগ্ম পরিচালক)
মিঃ মানি পেনি	(ঐ)
দি প্রিটেনডেড বাস্ক	(মঞ্চ ও আলোকসম্পাত)
দি জেলাস ওল্ডম্যান	(ঐ)
লা বুফ এ তে সালতুয়া	(পরিচালনা ও মঞ্চনির্দেশ)
আন্তিগোনে	(পরিচালনা)

এ ছাড়াও
রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট
মিকাডো
এস্‌কেপ
ফ্যান
স্ক্যানস্‌ ফর দি গানডার
মেড ইন ফ্রান্স

ইত্যাদি নাটকের সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মিকাডো চলচ্চিত্রে তিনি সহকারী পরিচালক ছিলেন।

* নাটক

পাঠ সংকেত ঃ যথাক্রমে নাটকের নাম, নাট্যমঞ্চ, প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ, নাট্যকার এবং বন্ধনীর মধ্যে কাহিনী ও কাহিনীকারের নাম, সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম। (?) এবং···চিহ্নিত স্থানের তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া—রঙমহল ঃ ১৯৩১ (২৩ শ্রাবণ ১৩৩৮) ঃ যোগেশ চৌধুরী ঃ শিশিরকুমার, যোগেশ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রভা দেবী, কঙ্কাবতী, সরযূবালা, রাজলক্ষ্মী, শৈলেন চৌধুরী, কার্তিক দে, রবি রায়।

ঝড়ের রাতে—নাট্যনিকেতন (অধুনা বিশ্বরূপা) ঃ ১৯৩১ ঃ শচীন সেন ঃ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীহারবালা, নিরুপমাদেবী, রাধিকানন্দ, শেফালিকা (পুতুল)।

আলেয়া—নাট্যনিকেতন ঃ (?) ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীহারবালা, নিরুপমাদেবী, সমর ঘোষ, মণি ঘোষ, এবং জ্ঞান ঘোষ ।

দিদি—নাট্যনিকেতন ঃ (?) ঃ শিবরাম চক্রবর্তী (কাহিনী নিরুপমা দেবী) ঃ নীহারবালা, নিরুপমা, সুধীন সেন, নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

সিন্ধুগৌরব—রঙমহল ঃ (?) ঃ উৎপল সেন ঃ রবি রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, উৎপল সেন।

রঙের খেলা—রঙমহল ঃ······

*'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকটি পরিচালনা করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সতু সেন শিল্প-নির্দেশক ছিলেন।

সতু সেন ও নরেশ মিত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'মহানিশা', 'পতিব্রতা', 'বাংলার মেয়ে', 'পথের সাথী', 'চরিত্রহীন', 'দুই পুরুষ', 'ধাত্রীপান্না' ও 'অশোক'।

'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকটি সতু সেন ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী যৌথভাবে পরিচালনা করেন।

এছাড়া ছবি বিশ্বাস পরিচালিত 'স্বামী' এবং শিশির মল্লিক ও যামিনী রায় পরিচালিত 'শ্যামলী' নাটকে সতু সেন ছিলেন শিল্পনির্দেশক।

শাদী কি শূল—রঙমহল ঃ (?) ঃ (?) ঃ রবি রায়, চারুবালা দেবী, ললিত বাবু।

মহানিশা—রঙমহল ঃ ১৫ এপ্রিল '৩৩ ঃ যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী অনুরূপা দেবী) ঃ নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পুতুল, চারুবালা দেবী।

অশোক—রঙমহল ঃ ২ ডিসেম্বর '৩৩ ঃ মন্মথ রায় ঃ রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নরেশ মিত্র, চারুবালা দেবী।

পতিব্রতা—রঙমহল ঃ ৩১ মার্চ '৩৪ ঃ যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'স্পর্শমণি') ঃ নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পুতুল, শান্তি গুপ্তা, যোগেশ চৌধুরী।

বাঙলার মেয়ে—রঙমহল ঃ ২০ সেপ্টেম্বর '৩৪ (৩ আশ্বিন ১৩৫১) ঃ যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "পথের শেষে") ঃ নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, পুতুল, চারুবালা দেবী।

পথের সাথী—রঙমহল ঃ ৯ মে '৩৫ ঃ যোগেশ চৌধুরী ঃ নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা।

চরিত্রহীন—রঙমহল ঃ ১৯৩৫ ঃ যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী শরৎচন্দ্র) ঃ নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শান্তি গুপ্তা, পুতুল, চারুবালাদেবী।

কাজরী—রঙমহল ঃ ৭ অগাস্ট '৩৪ ঃ সৌরীন মুখোপাধ্যায় কৌতুকাংশ ও শৈলেন রায় গল্পাংশ ঃ যোগেশ চৌধুরী, চারুবালা, ভূমেন রায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।

নন্দরাণীর সংসার—রঙমহল ঃ (?) ঃ যোগেশ চৌধুরী ঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, প্রভা দেবী, শান্তি গুপ্তা, পুতুল, সুহাসিনী দেবী।

রাবণ—রঙমহল ঃ (?) ঃ যোগেশ চৌধুরী ঃ যোগেশ চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী।

সিরাজদ্দৌল্লা—নাট্যনিকেতন ঃ ২৯ জুন '৩৮ ঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, নীহারবালা, সরযূবালা, নিরুপমা, ভূপেন চক্রবর্তী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মণি ঘোষ, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়।

সমাজ—নাট্যনিকেতন ঃ (?) ঃ জ্যোতি বাচস্পতি ঃ ছবি বিশ্বাস।

মীরকাশিম—নাট্যনিকেতন ঃ ১৯৩৮ ঃ মন্মথ রায় ঃ নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, অপর্ণা দেবী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পথের দাবী—নাট্যনিকেতন ঃ ১৯ মে '৩৯ ঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (কাহিনী শরৎচন্দ্র) ঃ ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, কৃষ্ণধন, প্রভা দেবী, পুতুল।

মহামায়ার চর—নাট্যনিকেতন ঃ (?) ঃ যোগেশ চৌধুরী ঃ যোগেশ চৌধুরী, উৎপল সেন, পুতুল, নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

পরিণীতা—নাট্যনিকেতন ঃ ২৪ ডিসেম্বর '৪০ ঃ যোগেশ চৌধুরী (কাহিনী শরৎচন্দ্র) ঃ যোগেশ চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, নীহারবালা, ছায়াদেবী, রাধারাণী দেবী।

দুই পুরুষ—নাট্যভারতী (অধুনা গ্রেস) ঃ ১৯৪২ (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, ছবি বিশ্বাস, যোগেশ চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, রাজলক্ষ্মী, ছায়া দেবী।

পথের ডাক—নাট্যভারতী ঃ ৮ জানুয়ারী '৪৪ ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, কুমার মিত্র, প্রভা দেবী, রাজলক্ষ্মী, ছায়া দেবী।

দেবদাস—নাট্যভারতী ঃ (?) ঃ অমর ঘোষ (কাহিনী শরৎচন্দ্র) ঃ সরযূবালা, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, রঞ্জিৎ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী।

ধাত্রীপান্না—নাট্যভারতী : ১৮ নভেম্বর '৪৩ : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, কৃষ্ণধন, সরযূবালা, প্রভা দেবী, ছায়া দেবী, কেতকী দত্ত।

রামের সুমতি—রঙমহল : ২২ জুন '৪৪ : দেবনারায়ণ গুপ্ত (কাহিনী শরৎচন্দ্র) : জহর গাঙ্গুলী, বুদ্ধদেব মিশ্র, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন, সুহাসিনী দেবী, বেলা দেবী, রমা দেবী।

অধিকার— রঙমহল : ১৪ সেপ্টেম্বর '৪৪ : অয়স্কান্ত বক্সী : সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, সুহাসিনী, পূর্ণিমা।

এই স্বাধীনতা—রঙমহল : ২৪ ডিসেম্বর '৪৯ : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, লীলাবতী, সরযূবালা, অপর্ণা দেবী, রেখা চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়।

কামাল আতাতুর্ক—নিউ এম্পায়ার : (?) : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্তিধারা, সরযূবালা, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন, অয়স্কান্ত বক্সী।

স্বামী—করিন্থিয়ান (অধুনা অপেরা সিনেমা) : (?) : অমর ঘোষ (কাহিনী শরৎচন্দ্র) : ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা।

কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা—মিনার্ভা থিয়েটার : ৫ জুলাই '৫৭ : কেদারলাল রায় : মিহির ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, সরযূবালা, সীতা দেবী।

অসবর্ণা—রঙমহল : (?) : জলধর চট্টোপাধ্যায় : ··· ···

সংঘাত—রঙমহল : (?) : সুশীল দে : ··· ···

নষ্টনীড়—রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে : (?) : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে) : ··· ···

শ্যামলী—ষ্টার : ১৫ অক্টোবর '৫৩ : দেবনারায়ন গুপ্ত : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, রমা দেবী ও সরযূবালা।

মন্ত্রশক্তি—৩১ আগস্ট '৩৫ : উত্তরা : কাহিনী অনুরূপা দেবী : প্রযোজক পপুলার পিকচার্স : গীতিকার/সুরকার শৈলেন রায়/কৃষ্ণচন্দ্র দে : চিত্রগ্রহণ সুরেশ দাস : অভিনয়াংশে—জহর গাঙ্গুলী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা।

আবর্ত ন—৯মে '৩৬ : শ্রী : কাহিনী নিশিকান্ত বসুর 'ধর্ষিতা' : চিত্রনাট্য হেমন্ত গুপ্ত : প্রযোজক পপুলার পিকচার্স : গীতিকার / সুরকার শৈলেন রায় ও হাসিরাশি দেবী / সুরসঙ্ঘ : সম্পাদনা চারু রায়, চিত্রগ্রহণ ভি, ভি, দাতে, শব্দযন্ত্রী চার্লস ক্রীড, দৃশ্যপট মতিলাল : অভিনয়াংশে—সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ধীরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী, শান্তি গুপ্তা, প্রভা দেবী, রেণুকা রায় ও রাণীবালা।

পণ্ডিত মশাই—২৮ নভেম্বর '৩৬ : শ্রী : কাহিনী শরৎচন্দ্র : চিত্রনাট্য সতু সেন : প্রযোজক পপুলার পিকচার্স : সুরকার কমল দাশগুপ্ত: চিত্রগ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযন্ত্রী মধু শীল : অভিনয়াংশে—রতীন, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী, শান্তি গুপ্তা, প্রভা দেবী, রেণুকা বায়, রাণীবালা।

ইমপস্টার বা ধুমকেতু—১৫ সেপ্টেম্বর '৩৭ : শ্রী : কাহিনী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : চিত্রনাট্য সতু সেন : প্রযোজক নিউ পপুলার পিকচার্স (সুধীর দাস) : গীতিকার শৈলেন রায় : চিত্রগ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযন্ত্রী মধু শীল, শিল্পনির্দেশনা পরেশ দাস : অভিনয়াংশে—রতীন, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত রায়, নিভাননী, শান্তি গুপ্তা, সাবিত্রী, অপর্ণা, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, আব্বাসউদ্দীন, বরিস ইসানোভিচ ও কিরা ইসানোভিচ।

সার্বজনীন বিবাহোৎসব—২৬ এপ্রিল '৩৮ : উত্তরা : কাহিনী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : প্রযোজক কালী ফিল্মস্ : গীতিকার / সুরকার কমল

দাশগুপ্ত ঃ চিত্রগ্রহণ সুরেশ দাস, শব্দযন্ত্রী মধু শীল ঃ অভিনয়াংশে—জীবন গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, মণি সেন, জহর গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, রাণীবালা, সাবিত্রী, রেখা।

চোখের বালি—৩০ জুলাই '৩৮ ঃ শ্রী ঃ কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রযোজক বি, পি, মেহেতা এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স ঃ গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঃ চিত্রগ্রহণ ননী সান্যাল, শব্দযন্ত্রী মধু শীল ঃ অভিনয়াংশে—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, অমি গুহঠাকুরতা।

স্বামী-স্ত্রী—২১ মার্চ '৪০ ঃ উত্তরা ঃ কাহিনী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ প্রযোজক কমল টকিজ লিমিটেড ঃ গীতিকার / সুরকার শৈলেন রায়/হিমাংশু দত্ত ঃ আবহসঙ্গীত দক্ষিণা ঠাকুর, চিত্রশিল্পী বিভূতি লাহা, শব্দযন্ত্রী জগদীশ বসু ঃ অভিনয়াংশে—ছবি বিশ্বাস, অয়স্কান্ত বক্সী, সন্তোষ সিংহ, কৃষ্ণধন, ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, চন্দ্রাবতী ও অপর্ণা।

সম্পাদকের বক্তব্য

এই গ্রন্থের প্রথম রচনা সতু সেনের 'আত্মস্মৃতি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৮ সালের শারদীয় সংখ্যা এক্ষণ পত্রিকায়। ক্রোড়পত্র-আকারে প্রকাশিত ঐ লেখাটির নিচে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি ছাপা হয়েছিল।

"মঞ্চ-প্রয়োগাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন (সতু সেন) গত সাতই আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন। প্রায় এক যুগ যাবৎ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় জড়িত থাকার দরুণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার ও বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখে নানা তথ্য শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর বৈচিত্রময় কর্মজীবন সম্পর্কে এক্ষণ-পত্রিকার সম্পাদক যখন উৎসুক্য প্রকাশ করেন, তখন আমি তাঁকে একটি স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ করি। তিনি শরীরের দিক থেকে অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং বাংলায় কিছু লেখায় তাঁর অনভ্যাস ছিল। তিনি যেভাবে বলে গেছেন, তাকেই আমি কাঠামো দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যাদিও এই রচনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত রচনাটি সমাপ্ত হওয়ার মাত্র দু'দিন পূর্বে তিনি গত হন। শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা তাঁকে পাঠ ক'রে শোনাতে পারি নি। ফলে, দেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী তাঁর কর্মজীবন-সম্পর্কিত অংশটি অত্যন্ত

সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ রয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে, নাট্য নিকেতনে মঞ্চ-পরিচালক থাকাকালীন সতু সেন কর্তৃক মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও অভিনয়-শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুল তৈরির অভিনব প্রচেষ্টার কথা। এ জাতীয় আরও কিছু তথ্য রচনাটিতে অনুল্লিখিত রয়েছে। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী সেনকে সম্পূর্ণ রচনাটি শোনাই এবং তিনি এটি প্রকাশের অনুমতি দেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রচনাটি এক্ষণ-এ প্রকাশিত হওয়ার পর দু-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে। এই গ্রন্থে সেগুলি সংশোধিত হয়েছে। তথ্যের একটি মারাত্মক ত্রুটি অবশ্য এখানে ঘটে গেছে। লেখা হয়েছে, সতু সেন ১৯৩২-এ ভারতে ফিরে আসেন। বস্তুত তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৩১-এ। এই প্রমাদের জন্য আমি আন্তরিকভাবে লজ্জিত।

বিভিন্ন স্থানে নাটক সম্পর্কে শিক্ষাদানের সময় তিনি তাঁর বক্তৃতামালাকে 'The Stage-craft', 'The Lighting' এবং 'The Technique of Acting'—এই তিনটি পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন।

১৯৫৭-র প্রথম দিকে 'মঞ্চকারু' এই নামে প্রথম রচনাটির আমি অনুবাদ করি। এখানে রচনাটিকে আদ্যন্ত পরিমার্জনা করা হয়েছে। 'আলো' এবং 'অভিনয় বিজ্ঞান'-এর অন্তর্গত মোট তিনটি নিবন্ধের অনুবাদ করেছেন সতু সেনের একমাত্র পুত্র শ্রীপার্থ সেন এবং নাট্যমোদী তরুণ শ্রীসমীর রায়। এরা দুজনেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক-বিভাগে বর্তমানে অধ্যয়নরত। এ ছাড়া

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সংযুক্ত সতুসেন-পরিচালিত ও শিল্প-নির্দেশিত নাটকাভিনয় সম্পর্কে যে বিস্তৃত তালিকাটি উদাহরণযোগ্য নিষ্ঠা, অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা আবিষ্কার ও বিন্যস্ত করেছেন, তা' গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁদের যথাযোগ্য সহায়তা ও পরামর্শ দানের জন্য আমি প্রবীন চলচ্চিত্র ও নাট্যরসিক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় এবং সতু সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরবি সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সতু সেনের মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত পত্রপত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১-এর বিনোদন সংখ্যা দেশ-পত্রিকায় 'আমেরিকায় শিশিরকুমার-সতু সেন প্রসঙ্গে' এই নামে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি। রচনাটিকে প্রামাণিক করে তোলার জন্য আমেরিকায় অভিনয় করার বিষয়ে সেখানকার এক উদ্যোক্তার সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তার আংশিক প্রতিলিপি, তাঁর দলের দ্বারা সেখানে অভিনীত বিভিন্ন নাটক সম্পর্কে মার্কিন পত্র-পত্রিকার মন্তব্যের কিছু কিছু অংশ ফোটোস্ট্যাট ক'রে প্রকাশ করা হয়েছিল।

বিভিন্ন পরিপূরক রচনা থাকার দরুণ এই গ্রন্থে উপরোক্ত রচনাটিকে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করতে হল। শিশিরকুমার-স্বাক্ষরিত চুক্তিনামাটির পূর্ণ বয়ানের অনুবাদ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হল।

বাংলা নাট্যমঞ্চের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপদানের ক্ষেত্রে সতু সেনের অবদান অসামান্য। বহু ক্ষেত্রেই তিনি প্রবর্তকের মর্যাদা পেতে পারেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত ১৯৩১-এর শেষার্ধে অভিনীত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে রঙমহল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

এই নাটকেই সর্বপ্রথম মুড-লাইটিং-এর প্রয়োগ করে সতু সেন আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেন। ঐ বছরই তিনি এককভাবে পরিচালনা করেন 'ঝড়ের রাতে।' আমাদের দেশে সীমিত সময়ে অর্থাৎ তিন ঘণ্টার বন্ধনীতে অভিনীত প্রথম নাটক যে এটিই, তা অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। মঞ্চে আলো ও শব্দের সাহায্যে ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের প্রথম রূপায়ন এই নাটকাভিনয়ের সময়েই হয়।

যতদূর জানা গেছে, কাজী নজরুল ইসলামের রচনাকে মঞ্চস্থ করার প্রথম কৃতিত্ব সতু সেনের প্রাপ্য। নজরুলের 'আলেয়া' নাট্য-নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) একটি অপেরাধর্মী নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। সুরকার ছিলেন কবি স্বয়ং।

১৯৩৩-এর ১৫ এপ্রিল রঙমহলে প্রথম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতে আক্ষরিক অর্থে বিপ্লব আনেন সতু সেন। এই অভিনব মঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় অনুরূপা দেবী প্রণীত ও যোগেশ চৌধুরীর দ্বারা নাট্য-রূপায়িত 'মহানিশা' নাটক। নাটকটি অভিনয়কালে দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতের মাধ্যমে মঞ্চে কপোতাক্ষী নদের বুকে আন্দোলিত ষ্টিম লঞ্চ যেভাবে দেখানো হয়, তা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও বিস্ময় উৎপন্ন করে।

ব্যক্তিতান্ত্রিক অভিনয় রীতির সমাপ্তি ঘটিয়ে দলগত সুসম অভিনয় ধারা প্রবর্তনে সতু সেনের প্রয়াস ছিল অপরিসীম। ১৯৩৫-এর মে মাসে রঙমহলে অভিনীত ও তাঁর পরিচালিত 'পথের সাথী' দেখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতভাবে মন্তব্য করেন, " 'পথের সাথী' রঙমহলের রঙ্গমঞ্চে দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, তাতে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে অভিনয়কলাকে চরম উৎকর্ষে উন্নীত করার প্রচেষ্টা আজ কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিশেষত্ব নয়।"

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি প্রথম শোনা

যায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' অভিনয় কালে। একটি বিশেষ মুহূর্তে সতু সেন সুসঙ্গতভাবে কবিতাটিকে সেখানে ব্যবহার করেছিলেন।

রঙমহলে যোগেশ চৌধুরী প্রণীত 'রাবণ' নাট্যাভিনয়ের সময়ে প্রণম্য শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মঞ্চ-পরিকল্পনা করেন সতু সেন। ১৯৩৮-এর জুন মাসে নাট্য নিকেতন-মঞ্চে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সহযোগে তিনি যখন 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অনুরোধে নাটকটির গীতিরচনা ও সুরদান করেন।

মঞ্চ পরিকল্পনা ও সাজসজ্জায় সময়ক্রমকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস সতু সেনের সব সময়ই ছিল। প্রবীণ নাট্যমোদীরা অনেকে এখনো স্মরণ করতে পারেন 'সিন্ধুগৌরব' নাটকের সেই রাজকীয় মঞ্চসজ্জা, যেখানে মঞ্চ জুড়ে সিন্ধু নদের উপকূলে বিশাল নৌকার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অথবা 'অশোক'-এর মঞ্চ পরিকল্পনায় অশোক যুগের পরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতার কথা স্মরণ করা যায়। মঞ্চের ওপর বিশাল বৌদ্ধবিহার, দৃশ্যের পর দৃশ্যের অনবদ্য কারুচিত্র-পরিকল্পনা এবং মুড লাইটিং-এর গভীর ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ দর্শকদের স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় আবেগপ্রবণ, জাতীয়তাবাদী ইংরেজীতে তো প্রায়ই এরকম মন্তব্য করা হত—'Cheer up Rangmahal! You have revived the fallen glory of Bengali Stage' অথবা '...of all play houses in Calcutta to day, Rangmahl is probably doing most to build up a sound tradition for the Bengali Stage on entirely new lines...'.

তথাকথিত নাটকীয়তাবিহীন আপাত শাদামাটা বিষয়কেও উপস্থাপনের গুণে আকর্ষণীয় করার কৌশল সতু সেনের আয়ত্তে ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ১৯৩৪-এর আগষ্ট মাসে তাঁর পরিচালিত 'কাজরী' নাটকটির কথা মনে আসে। নাটকের মহড়া

কক্ষের ঘটনাবলীকে নিয়ে লেখা একটি কাহিনী সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিলেন তিনি।

এ দেশের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কাহিনীকে মঞ্চস্থ করার প্রথম গৌরবও তাঁর। নাট্য-ভারতী মঞ্চে (অধুনা গ্রেস সিনেমায় রূপান্তরিত) বাংলা ১৩৪৯-এর ১৪ জ্যৈষ্ঠ (মে, ১৯৪২) তারাশঙ্কর-রচিত ও নাট্যরূপায়িত 'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি আশাতীত ভাবে মঞ্চসফল হয়েছিল। ফলে, পরবর্তী কালের অনেক নাট্য-পরিচালকই তাঁর রচনার মঞ্চরূপ দিতে আগ্রহী হন। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও সামগ্রিক পরিকল্পনার জন্য 'দুই পুরুষ' সমস্ত সংবাদপত্র দ্বারা যে ভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল, তা প্রায় অভূতপূর্ব।

যত বড় সাহসী পরিচালকই হন না কেন, শুধু প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্বে কেন, পঞ্চাশের দশকেও কেউ গান বাদ দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ভাবতে পারতেন না। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে নাট্য-ভারতীতে শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত 'ধাত্রী পান্না' নাটকটিকে মঞ্চরূপ দিতে গিয়ে এই ঝুঁকি প্রথম গ্রহণ করেন সতু সেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে অভিনয় চলা কালে ঘটনার পর ঘটনার আবর্তে দর্শক-মনকে এমন ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হত যে গানের অভাববোধ তাঁর আদৌ হত না। 'ধাত্রী পান্না'-র বিজ্ঞপ্তিতে সতু সেনের সহকারী পরিচালক রূপে যুগ্মভাবে প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী ও রবি রায়ের নাম দেখা যায়।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্তত একটি নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজকের ভূমিকায় ছিলেন, এ তথ্য পাওয়া যায়। রঙমহলে ১৯৪৪-এর ২২ জুন অভিনীত হয় তাঁর বিখ্যাত গল্প 'রামের সুমতি'। কাহিনীর নাট্যরূপ দেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্য-নিয়ন্ত্রক (?)-এর পদে ছিলেন সন্তোষ সিংহ।

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক 'কামাল আতাতুর্ক' মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনাটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই রাজকীয়। সতু সেন নিজেই বলেছেন, 'এই নাটক রচনা ও পরিচালনার জন্য নাট্যকার ও আমাকে তুরস্ক-বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ পরিশ্রম-সহকারে পাঠ করতে হয়েছিল।' তাঁর বক্তব্যে এও জানা যায় যে তুরস্কের কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তিনি 'কামাল আতাতুর্ক' নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

বিপুল ব্যয়ে এবং আড়ম্বরের মাধ্যমে নাটকটি নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। মঞ্চসজ্জা ও সাজপোশাকে ঐতিহাসিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সতু সেন বিশেষভাবে সফল হয়েছিলেন। এই নাটকে আলোকসম্পাত একটি সহযোগী উপকরণ না হয়ে বস্তুত একটি চরিত্ররূপেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে 'কামাল আতাতুর্ক', 'বিষ্ণুপ্রিয়া' বা 'ঝড়ের রাতে'-র যোগ্য উত্তরসূরী। সতু সেন তাঁর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে নীতিশ মুখোপাধ্যায় 'কামাল আতাতুর্ক'-এর নাম ভূমিকায় ছিলেন। বস্তুত ঐ ভূমিকাতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন ছবি বিশ্বাস। তা ছাড়া স্বয়ং সতু সেন এই নাটকে অভিনয় করেন।

প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্য-অভিনেতা ছবি বিশ্বাস যে অন্তত একটি নাটকের পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, একথা আজ প্রায় অজ্ঞাত। নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী' কাহিনীর অমর ঘোষ-কৃত নাট্যরূপ। করিন্থিয়ান নাট্যমঞ্চে (অধুনা অপেরা সিনেমা) নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। শিল্প-নির্দেশকের ভূমিকায় ছিলেন সতু সেন। নাটকটি অভিনয়ের সময়ে মুষলধারে বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছিল।

নাট্য-পরিচালক হিসেবে সতু সেন শেষবার আত্মপ্রকাশ করেন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ১৯৫৭-র ৫ জুলাই 'কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা' নাটকের

উদ্বোধনের মাধ্যমে। একটি পুরাকাহিনীকে আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সম্মত জটজটিলতা সহ প্রকাশ করার প্রচেষ্টা নাটকটিতে ছিল। আলোর সাহায্যে নাট্য-মানসিকতা প্রতিফলনের রীতিমত পরিণত প্রয়াস 'কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা'-য় দেখা যায়।

সত্নু সেন রচিত 'The Stage Craft'-এর পাণ্ডুলিপিটির পুরো অনুবাদ এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। রচনাটিকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করলে তা' একটি পুস্তিকার আকার নেবে। কিন্তু আলো ও অভিনয়-বিজ্ঞান নিয়ে রচিত তাঁর যে দুখানি পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে আছে, সে দুটিই পরিপূর্ণ গ্রন্থবিশেষ। শুধু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক-বিষয়ক অধ্যাপক রূপেই নন, দিল্লীর ন্যাশানাল স্কুল অব ড্রামা ও এশিয়ান থিয়েটারের পরিচালক থাকার সময়েও ঐ পাণ্ডুলিপি দুটিকে তিনি পঠন-পাঠন কালে বিশেষ রূপে ব্যবহার করেছিলেন। 'The Lighting' পাণ্ডুলিপিটির দু-একটি অংশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে বলে এখনই পাঠকের সামনে তার অন্তর্গত অধ্যায়গুলি কি কি, উল্লেখ করে উঠতে পারছি না। 'The Technique of Acting'-এ বিষয়-সূচি নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

Chapter I—Process of creation of different arts, spirit, will, different spirit of concentration.

Chapter II—Creation of a new human soul, life in action, orders. Function of a Director.

Chapter III—Long distance mood, spine, Beat.

Chapter IV—Technique, Nature, Inspiration and Imagination.

Chapter V—Memory of feeling.

Chapter VI—How to apply memory of feeling to practice.

এগুলির মধ্য থেকে এই গ্রন্থের কেবল পঞ্চম অধ্যায়টির অনুবাদ এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে সময়ে সুযোগে সমগ্র পাণ্ডুলিপিটির অনুবাদ করার বাসনা আছে। 'The Lighting' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, সতু সেনের এই প্রধান রচনা দুটি মূল ইংরেজিতে প্রকাশিত হলে—সর্বভারতীয় স্তরে নাট্যকর্মীদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে আমার বন্ধু এবং 'অন্বিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। গ্রন্থটি প্রকাশের মুহূর্তে এ জন্য প্রথম অভিনন্দন তাঁরই প্রাপ্য।

মুদ্রণকার্য চলাকালীন সমগ্র সময় আমি রোগশয্যায় বন্দী ছিলাম এবং এখনও আছি। সমস্ত বিষয়টি নিছক পরিকল্পনার আকারেই থেকে যেত, যদি শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য নিজে থেকে অগ্রসর হয়ে পরম মমতায় এটিকে নিজের কাজ ব'লে হাতে তুলে না নিতেন। প্রুফ-সংশোধন, অধ্যায়-বিন্যাস, মুদ্রণ পারিপাট্য, খসড়া পরিকল্পনার মার্জনা, নাম-সূচী নির্মাণ—এক কথায় গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় প্রতিটি স্তরে তিনি যে শ্রম স্বীকার করেছেন, তা আমার কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

প্রখ্যাত আলোক-শিল্পী শ্রীতাপস সেন সতু সেনের যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর সংশ্লিষ্ট-রচনাটি আমার সম্পাদনার দৈন্য কিছু পরিমাণে নিশ্চয় লাঘব করবে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলির কয়েকটি ব্লক বহুরূপী পত্রিকার সৌজন্যে পেয়েছি। সতু সেনের সহধর্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী

সেন গ্রন্থটি প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য ও চিত্র তাঁর সংগ্রহ থেকে উদার ভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুষ্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নয়।

বিভিন্ন ভাবে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযীশু চৌধুরী, শ্রীপ্রবীর সেন ও শ্রীঅজয় গুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বোপরি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আশা প্রকাশনীর তরুণ কর্ণধার শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে, যিনি গ্রন্থটিকে শোভন ক'রে তোলার জন্য তাঁর দিক থেকে কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

গ্রন্থে যা কিছু অসঙ্গতি ও বিচ্যুতি রয়ে গেল, তার দায়িত্ব আমার। নিছক অসুস্থতার দোহাই এক্ষেত্রে নিশ্চয় কার্যকর নয়। এ-সত্ত্বেও যদি গৌড়ীয় নাট্যরসিকরা গ্রন্থটিকে গ্রহণ করেন, তবেই আমার ও আমার সহযোগীদের যৌথ শ্রম পুরস্কৃত হবে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নামসূচী